সাপ্তাহিক সংকলন

রজি: ডিএ ৬০৫৮ | সংখ্যা-২ | সোমবার, ১৮ ভাদ্র ১৪২০, ২৫ শাওয়াল ১৪৩৪, ০২ সেপ্টেম্বর ২০১৩ ৩২ পৃষ্ঠা ১০ টাকা

গত সপ্তাহে দৈনিক দেশেরপত্রে প্রকাশিত
উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ সংকলন

অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি সমান?

হিন্দু-মুসলমান
পৃষ্ঠা-১২

ঐশীর চিঠির জবাব
পৃষ্ঠা-২১

চলমান সঙ্কট ও আসন্ন ধ্বংস থেকে মানবজাতির বাঁচার একমাত্র পথ: পৃষ্ঠা-৭

যে প্রশ্নের উত্তর জানতেই হবে
পৃষ্ঠা-২০

বিশ্ব মোড়লদের **WAR GAME**
পৃষ্ঠা-৪

DIVIDE & RULE পৃষ্ঠা-১৬

মানবতার কল্যাণে সত্যের প্রকাশ

দৈনিক
Dainik Desherpotro
দেশেরপত্র

www.desherpatro.com

সম্পাদকীয়

পাঠকদের অনুরোধ উপেক্ষা করতে না পেরে এ সপ্তাহে দৈনিক দেশেরপত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধ, নিবন্ধগুলো নিয়ে প্রকাশিত হল সাপ্তাহিক সংকলন। সংকলনটি পাঠকদের হাতে পৌঁছানোর আগেই হয়ত সিরিয়ায় ইঙ্গ-মার্কিন রণদামামা বেজে উঠবে। শুধু বারাক ওবামার একটি অংগুলি হেলানোর অপেক্ষা। সিরিয়ায় সাধারণ মানুষের ওপর রাসায়নিক গ্যাস দিয়ে হামলা চালিয়েছে বাশার আল-আসাদ এমন অভিযোগেই এই বিমান ও নৌ হামলা। গত সপ্তাহে দামেস্কের অনতিদূরে এক হাজারেরও বেশি বেসামরিক নারী-পুরুষ ও শিশু রাসায়নিক অস্ত্রের প্রয়োগে নিহত হয়। অবশ্য সিরিয়া সরকারের কর্তৃপক্ষ দাবি করেছে, বিদ্রোহীরাই বাশার আল আসাদকে বেকায়দায় ফেলার জন্য সাধারণ মানুষের ওপর এই হামলা চালিয়েছে। বিষয়টি নিয়ে জাতিসংঘের একটি টিম তদন্ত করছে। তারা কোন মতামত প্রকাশের আগেই গতকাল মার্কিন ভাইস-প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহারের জন্য সিরিয়া সরকারকেই দায়ী করেছেন। হঠাৎ করে যেন সিরিয়ার জনগণের জন্য পশ্চিমাদের দরদ উথলিয়ে পড়ছে। কুমীরের অশ্রুবর্ষণ কি একেই বলে? অথচ সিরিয়ার বিদ্রোহীদের ভয়ঙ্কর সব যুদ্ধাস্ত্র সরবরাহ করে সিরিয়াকে গৃহযুদ্ধে ঠেলে দিয়েছে এই পশ্চিমারাই। মজার ব্যাপার হচ্ছে এই বিদ্রোহীদের সঙ্গে জোট বেঁধেছে যুক্তরাষ্ট্রের ঘোষিত শত্রু আল-কায়েদা এবং আল-কায়দার নেতৃত্বাধীন বেশ কয়েকটি ইসলামী গ্রুপ। দেখা যাচ্ছে পশ্চিমাদেরই অস্ত্রে লড়াই করছে আল-কায়েদা বাশার আল আসাদের বিরুদ্ধে। যুদ্ধের পরিণতিতে লক্ষ লক্ষ মানুষ গৃহহীন হয়েছে, উদ্বাস্তু হয়েছে, নিহত হয়েছে হাজার হাজার। একই নাটক চলছে মিশরেও। সেখানে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত মুরসী সরকারকে অস্ত্রের জোরে অপসারণ করে সেনাবাহিনী আসে ক্ষমতায়। স্বাভাবিকভাবেই নির্বাচনে বিজয়ী মুরসী সরকারের এক বছর অতিক্রম না হতেই ক্ষমতাচ্যুতি মিসরবাসী মেনে নিতে পারে নি। লক্ষ লক্ষ জনতা এর প্রতিবাদে রাস্তায় নেমে আসে। অবস্থান নেয় ফাতাহ্ স্কোয়ারে। সেনাবাহিনী ভয়ঙ্কর সব যুদ্ধাস্ত্র, ট্যাংক ও স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাধরণ নিরস্ত্র জনতার উপর। গুলি করে হত্যা করে এক হাজারের বেশি মানুষ। এক্ষেত্রে কিন্তু পশ্চিমাদের আচরণ সিরিয়ার বিপরীতমুখী। এখানে আর কোন পশ্চিমা দরদ দেখাতে আসেন না। গণতন্ত্রের প্রবর্তকদের মুখোশ উন্মোচিত হয় বিশ্ববাসীর সম্মুখে। লিবিয়াতেও চলছে একই ইঁদুর বিড়াল খেলা। লিবিয়ার একাধিক বিদ্রোহী গ্রুপকে সার্বিক সহায়তা দিয়ে পরিপুষ্ট করা হচ্ছে। এভাবে পৃথিবীর সর্বত্র মোসলেম নামধারী এই জনসংখ্যাটি আজ পশ্চিমাদের নানারকম পরীক্ষাগারে পরিণত হয়েছে। যখন যে দেশকে খুশি সেই দেশকে সন্ত্রাসী বানাচ্ছে। সন্ত্রাসীদেরকে অস্ত্র সহায়তা তারাই দিচ্ছে। আজ পর্যন্ত এমন কোন খবর পাওয়া যায় নি যে, ইসলামী জঙ্গী গোষ্ঠীর মালিকানাধীন কোন অস্ত্র বা ক্ষেপণাস্ত্র তৈরির কারখানা আছে। এদের কাছে অস্ত্র বিক্রি করছে পশ্চিমারাই। পশ্চিমারা তাদের প্রয়োজনে তাদেরকে সৃষ্টি করছে আবার জঙ্গী দমনের নামে বা গণতন্ত্র কিম্বা শান্তি প্রতিষ্ঠার অজুহাতে রাষ্ট্রও দখল করে নিচ্ছে। তালেবান ও আলকায়দা এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

আল্লাহর তওহীদ (সার্বভৌমত্ব) অস্বীকারকারী, আল্লাহ্র দীন প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া প্রত্যাখানকারী বর্তমানের মোসলেম বলে পরিচিত জনসংখ্যাটি আল্লাহ্র অভিশপ্ত হওয়ার কারণে এ বোধশক্তি হারিয়ে ফেলেছে যে, কেন আল্লাহ তাদেরকে এভাবে অন্য জাতির গোলাম বানিয়ে দিয়েছেন, কেন তাদেরকে পশ্চিমাদের খেলার উপকরণ বানিয়ে দিয়েছেন। তাই তারা আল্লাহর দেয়া জীবনব্যবস্থা প্রত্যাখান করে ওদের রাজনৈতিক মতাদর্শ গ্রহণ করে রাজনৈতিক হানাহানিতে নিজেরা লিপ্ত আছে।

আমরা আশা করব, আরও একটি ইরাকের সৃষ্টি না হোক। জর্জ বুশের মত বারাক ওবামাকেও যেন বলতে না হয়, আমাদের গোয়েন্দা রিপোর্ট ভুল ছিল। অভিজ্ঞ মহলের আশঙ্কা, সিরিয়া আক্রমণের প্লট পূর্বেই তৈরি করে রাখা হয়েছিল এখন শুধু বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া চলছে। এসব ঘটনাপ্রবাহ থেকে আমাদেরও শিক্ষা নেওয়ার বিষয় রয়েছে। যামানার এমাম এমামুয্যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী সকল ভেদাভেদ ভুলে তওহীদের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার, সকলে মিলে এক জাতি হওয়ার জন্য যে আহ্বান কোরেছেন। সুতরাং সময় থাকতে সকল রাজনৈতিক হানাহানি ভুলে আল্লাহর সার্বভৌমত্বের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজন। অন্যথায় হতে পারে আমাদের জন্যও হয়তো একই পরিস্থিতি অপেক্ষা করছে। ইতোমধ্যে সামারিক বাহিনীতে ব্যবহৃত যেসব স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র জঙ্গীদের কাছ থেকে উদ্ধার হওয়া শুরু হয়েছে তা এদেশকে আফগানিস্তান বা পাকিস্তান বানানোর আলামত বলেই মনে হচ্ছে। বর্তমানের হিংসার রাজনৈতিক সিস্টেম পরিহার করে ঐক্যবদ্ধ হওয়া ছাড়া আর কোন পথ খোলা নেই। দেশের পরিচালকদেরকে সময় থাকতেই বুঝতে হবে, আকাশের এক কোণে পুঞ্জিভূত কালো মেঘ আর থমথমে পরিবেশ কিসের আভাস।

সম্পাদক: শাহানা পন্নী (রুফায়দাহ)
প্রকাশক : এডভোকেট আমিনুল হক আকবর। সম্পাদক কর্তৃক মিতু প্রিন্টিং প্রেস, ১০/১, নয়া পল্টন, ঢাকা-১০০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
বার্তা ও বাণিজ্যিক কার্যালয়: ২২৩, মধ্য বাসাবো (সবুজবাগ থানা সংলগ্ন) সবুজবাগ, ঢাকা- ১২১৪। ফোন: ০২-৭২১৮১১১, ০১৭৭৮২৭৬৭৯৪, বিজ্ঞাপন বিভাগ: ০১৮১৯২৭৮৭৮২, ইমেইল: desherpattro13@yahoo.com

আসুন সিস্টেমটা পাল্টাই

সূচিপত্র

বিশ্ব মোড়লদের WAR GAME উত্তপ্ত মধ্যপ্রাচ্যের নেপথ্যে কে? পৃষ্ঠা-৩	দাজ্জালের বিভক্তিকরণ নীতি: শোষণের হাতিয়ার: পৃষ্ঠা-১৬
সার্বভৌমত্ব কি? পৃষ্ঠা-৫ মানবজাতির বাঁচার একমাত্র পথ: পৃষ্ঠা-৭	যে প্রশ্নের উত্তর জানতেই হবে: পৃষ্ঠা-২০ ঐশীর চিঠির জবাব: পৃষ্ঠা-২১
হেযবুত তওহীদের বিরুদ্ধে আবারও অপপ্রচার শুরু হোয়েছে:পৃষ্ঠা-৬	কোন পথে মিশর লড়াইটা আসলে কার? পৃষ্ঠা-২৩
মোসলেম নামক জনগোষ্ঠী তওহীদে নেই: পৃষ্ঠা -৯	একজন মোজাহেদের জীবন: পৃষ্ঠা-২৪ অন্ধ ও চক্ষুস্মান কি সমান? পৃষ্ঠা-২৫
ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে মাননীয় এমামুয্যামান: পৃষ্ঠা-১১	এসলামে 'সালাম' প্রসঙ্গ: পৃষ্ঠা-২৮ আমি হব সকাল বেলার পাখি: পৃষ্ঠা-২৯
হিন্দু-মুসলমান: পৃষ্ঠা-১২ প্রকৃত এসলামে জুম'আর চিত্র: পৃষ্ঠা-১৪	বাংলা ভাষায় প্রবিষ্ট আরবী শব্দের বিকৃতি: পৃষ্ঠা-৩০
দুটি শিক্ষ্যণীয় গল্প: পৃষ্ঠা-১৫	মসজিদে দুনিয়াবি কথা বলা কে হারাম কোরল? পৃষ্ঠা-৩২

ক্লান্তি আর ক্ষুধা ছাড়া এই সিস্টেম আর কি দিতে পেরেছে তোমাদের?
জড়বাদি এই সিস্টেমের নিচে চাপা পড়ে গেছে তোমাদের আত্মার ক্রন্দন

বিশ্ব মোড়লদের WAR GAME

উত্তপ্ত মধ্যপ্রাচ্যের নেপথ্যে কে?

আতাহার হোসাইন

খুব পুরনো গল্প। সবারই জানা। কিন্তু গল্পটির আবেদন এখনো হারিয়ে যায় নি বলেই মনে হয়। চিরচেনা, চিরন্তন এ গল্প। মূল গল্পটি এ রকম:- একদিন এক ঝর্ণায় গিয়ে একটি খরগোশ পানি খাচ্ছিল। উপর থেকে এক সিংহ নেমে এল। তার অভিপ্রায় খরগোশকে সে খাবে। কিন্তু এর জন্য কোন একটা ছুতো দরকার। শত হলেও একেবারে কোন ছুতো ছাড়া তো আর খাওয়া যায় না। সিংহ খরগোশের কাছে এসে বললো, এই! তুই আমার পানি ঘোলা করেছিস কেন? আমি তোকে খাব। খরগোশ বললো, আমি তো ঝর্ণার নিচের দিকে ছিলাম। আপনিই তো উপরে ছিলেন। আমি ঘোলা করলে তো আপনার ওদিকে ঘোলা হওয়ার কথা নয়। যুক্তিতে সিংহ হেরে গেল। কিন্তু হেরে গেলে তো আর খাওয়া চলবে না। এবার সিংহ বললো, ওহ, ঠিক আছে। তুই করিস নি, কিন্তু তোর বাপ করেছে। অতপরঃ খরগোসের বাঁচার আর কোন উপায় রইল না। গল্পটি পশু এবং জঙ্গলের সঙ্গে মানানসই হলেও বর্তমানে মানুষের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হয়ে পড়েছে।

সিরিয়ার একনায়ক বাশার আল আসাদকে আমেরিকার পছন্দ নয়। সুতরাং তাকে ক্ষমতা থেকে নামাতে হবে। আরব বসন্তের নামে শুরু হোল বাশার বিরোধী আন্দোলন। 'ফ্রি সিরিয়ান আর্মি' নামে একটি বিদ্রোহী গ্রুপ সরকারের বিরুদ্ধে গৃহযুদ্ধের সূচনা করলো। পশ্চিমা শাসকগণ তাদের সমর্থন, অর্থ ও সামরিক সাহায্য দিয়ে উৎসাহ জোগালো। দীর্ঘ দুই বছরের গৃহযুদ্ধে প্রায় ৮০ হাজার মানুষ নিহত হলো আর ১৫ লাখ মানুষ উদ্বাস্তু হয়ে পার্শ্ববর্তী দেশগুলোতে শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় নিল। সর্বশেষ বাশার বাহিনী ব্যাপক অভিযানের মাধ্যমে বিদ্রোহীদের হাত থেকে পূর্বে অধিকৃত এলাকা পুণরুদ্ধার করে। কোনঠাসা হয়ে পড়ে বিদ্রোহী বাহিনী। মান-সম্মানের প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ায় বিশ্ব মোড়লদের। তাদের ইগো মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে, সিরিয়াকে ধ্বংস করতে হবে। সিংহের খরগোশ ভক্ষণ করতে যেমন ছুতো দরকার

তেমনি একটি ছুতোও আবিষ্কার করলো তারা। ছুতোটি হচ্ছে বিদ্রোহ দমনে সিরিয়ার পক্ষ থেকে নিষিদ্ধ রাসায়নিক অস্ত্রের ব্যবহার। সংবাদে প্রকাশ, কিছু দিন আগে এই রাসায়নিক অস্ত্রের হামলায় প্রায় ১৩শ' মানুষ নিহত হয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে বিদ্রোহ প্রায় নির্মূল করার সময়ে হঠাৎ বাশার বাহিনী কেনই বা রাসায়নিক অস্ত্র প্রয়োগ করতে যাবে? তা যদি প্রয়োগ করতেই হোত তবে আরো অনেক আগে করতে পারত। বিশেষ করে যখন সরকারি বাহিনী বিদ্রোহী বাহিনীর ক্রমাগত হামলার মুখে কোনঠাসা হয়ে পড়ছিল সেই সময়টাই ছিল তা ব্যবহারের উত্তম সময়। বিরোধীপক্ষ এই সময়ে এসে হঠাৎ যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য এই রাসায়নিক হামলা নিজেরাই করে নি কি? নিজের নাক কেটে অন্যের যাত্রা ভঙ্গ করানোর এই নীতিটি তো পশুরা নয়, একমাত্র মানুষই জানে। সামান্য এই ক্ষতির বিনিময়ে যদি যুদ্ধে বিজয়ী হওয়া যায় তাতে দোষের কী?

যাই হোক, যুদ্ধে এটা ঘটতেই পারে। যুদ্ধের আরেক নাম কৌশল। কিন্তু প্রশ্ন হোল এই যুদ্ধের নেপথ্যে কারা কলকাঠি নাড়ছে? ইসরাইল, আমেরিকা, ব্রিটেন তো অনেক আগে থেকে ঘোষণা দিয়ে প্রকাশ্যেই সিরিয়ায় বাশার সরকার পতনে কোমর বেঁধে নেমেছে। কিন্তু শেষ সময়ে সৌদি আরবের লাফালাফি সবাইকে ভাবিয়ে তুলছে। এটা ঠিক যে শিয়া সুন্নী দ্বন্দ্বে সৌদি আরব বাশার সরকারের উচ্ছেদ করা চাইতেই পারে। অপরদিকে ইরান শিয়া প্রধান হওয়ায় বাশার সরকারের প্রতি সৌহার্দ্যতা দেখাতেই পারে। তবে যেহেতু ইরান এবং সৌদি আরবের সাথে আদর্শগত দ্বন্দ্ব বিদ্যমান সেহেতু পুরনো বিরোধ এখানে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। উভয় পক্ষই এখন মরিয়া হয়ে মাঠে নেমেছে। খবরে প্রকাশ সিরিয়ার মিত্র রাশিয়াকে সিরিয়ার সঙ্গ ছাড়তে সৌদি সরকার তেল বাণিজ্যে বড় ধরনের সুবিধা দেওয়ার নামে ঘুষের প্রস্তাব দিয়েছিল। ইতোমধ্যে সৌদি সরকার প্রায় ৭ কোটি ডলার ব্যয় করেছে বিদেশী শক্তিগুলোকে উস্কানী দিয়ে সিরিয়ার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য। সর্বশেষ তারা সিরিয়ার উপর আরেকটি যুদ্ধ বাঁধিয়ে দিতে শুরু করেছে।

অন্যদিকে অপর বাহু মিশরে সামরিক বাহিনীর ক্ষমতা দখল এবং ইখওয়ানীদের উপর সামরিক অভিযানে প্রায় সহস্রাধিক যা ইখওয়ানের মতে ২ হাজার ২ শতেরও অধিক মানুষ হত্যা করা হয়। এর পেছনেও উস্কানী ও ইন্ধনদাতা হিসেবে কাজ করেছে সৌদি আরব। এ জন্য তারা শত কোটি ডলার ঘুষ দিয়েছে মিশরের সেনাবাহিনীকে। অভ্যুত্থান ঘটিয়ে মুরসি সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার সাথে সাথেই সৌদি সরকার মিশরের নব্য সামরিক সরকারকে শুভেচ্ছা জানায়। আর ঘুষ দেওয়া অর্থের ঐ অংশটি ছিল প্রাথমিক অংশমাত্র। এর পরে মুরসি সমর্থকরা প্রতিবাদে রাস্তায় নেমে এলে তাদের উপর সেনাবাহিনী কর্তৃক ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ চালানো হলেও সৌদি সরকার বিভিন্নভাবে সামরিক সরকারকে সমর্থন জানিয়ে তাদের মনোবল চাঙ্গা রাখে। অন্যদিকে এ হত্যাকাণ্ডে আন্তর্জাতিকমহল বিরূপ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলে এবং সামরিক সরকারকে চাপ প্রয়োগের প্রস্তাব করলে তাদের ব্যাপারে কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে সৌদি সরকার। ইরান শিয়া অধ্যুষিত হওয়ায় অনেক আগে থেকে শিয়া-সুন্নী নিয়ে তাদের মধ্যে বিরোধ চলে আসছে। কোন আগ্রাসী শক্তি যদি ইরানকে আক্রমন করে তাহলে সৌদি আরব যে খুশি হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। এমন কি এখনো যে তারা পাশ্চাত্যকে এ কাজে উৎসাহিত করছে না তাও জোর দিয়ে বলা যাবে না। অভিযোগ রয়েছে মধ্যপ্রাচ্যে জন্ম নেওয়া বিষফোঁড়া ইসরাইলের সাথে সৌদি রাজ পরিবারের রয়েছে বিশেষ সখ্যতা। ফিলিস্তিনি ভূ-খণ্ড দখলকারী এই দেশটি আরবদের এই অনৈক্য ও বিভেদের সুযোগে নব বধূর কপালের টিপের আকৃতি থেকে বর্তমানে সারা মধ্য প্রাচ্যকে গিলে খাবার উপক্রম সৃষ্টি হয়েছে। যা তাদের সকলের জন্যই এক মহা বিপদ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে।

খেয়াল করলে দেখা যায় মধ্যপ্রাচ্যের প্রায় প্রতিটি অস্থিরতার পেছনে হাত রয়েছে সৌদি আরবের রাজ পরিবারের। তাই সারা মধ্য প্রাচ্যের রাজনীতির আকাশে সৌদি আরব উদিত হয়েছে খলনায়কের ভূমিকায়। অথচ পুরো মধ্যপ্রাচ্য এলাকাটাই মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চল। খুব কম সংখ্যক ভিন্ন ধর্মের মানুষ বসবাস করে এখানে। শেষ ইসলামের প্রবর্তক রসুলাল্লাহর জন্ম এই মাটিতেই। তাঁরই অনুসারীরা আজ সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়লেও এ দেশের মাটিকে এখনো অনেক পবিত্র জ্ঞান করেন। এখানে রয়েছে বায়তুল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহর ঘর, পবিত্র ক্বাবা ঘরের উপস্থিতি। ক্বাবা হচ্ছে মোমেন মোসলেমদের ঐক্যের প্রতীক। মোসলেম উম্মাহ তার সমস্যা, পরামর্শ ইত্যাদির জন্য বৎসরে একবার এখানে উপস্থিত হন আরাফার ময়দানে। পরিচালনার দায়িত্বে থাকে সৌদি সরকার। অথচ সেই মাটিতে বসবাসকারী আরবগণ আজ শিয়া-সুন্নী দ্বন্দ্বে নিজেরা নিজেদের শক্তি ক্ষয় করছে। তারা প্রতি বছর হজ্ব করতে যায় ঠিকই, কিন্তু তাদের ব্যবধান ঘোঁচে না। ঘরে ফিরেই একে অপরের বিরুদ্ধে লাগেন। তবে শুধু যে ঘরে ফিরেই বিরুদ্ধে লাগেন তাই নয়। পবিত্র ক্বাবার প্রাঙ্গণেও এরা ঝগড়া করেন, মারামারি করেন, এরকম নজিরও বহু আছে। এই সুযোগকে ধূর্ত মোড়লরা কাজে লাগাবেই না কেন? ঘরের সমস্যায় যখন পরকে ডেকে আনা হয় তখন পর একটু সুবিধা গ্রহণ করবেই।

সব শেষে আরেকটি গল্প দিয়ে বিষয়টির ইতি টানি। যদিও গল্পটি থিসিস লেখার প্রসঙ্গে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু মনে হয় এর ব্যবহার আলোচ্য প্রবন্ধে বেমানান হবে না।

এক খরগোশ একটি গুহার বাইরে বসে ল্যাপটপে কাজ করছে, এমন সময় একটি শেয়াল এসে জিজ্ঞেস করছে, "কিরে, কি করিস?" খরগোশ জানালো, "থিসিস লিখি।" শেয়াল পাল্টা প্রশ্ন করলো, " কি নিয়ে থিসিস?" জবাব এলো, "শেয়াল খাওয়ার সহজ উপায়।" শেয়াল খুব অবাক হোল। প্রশ্ন করলো, "কি! খরগোশ কখনো শেয়াল খায়?" খরগোশ বললো, "বিশ্বাস হোল না, আমার সাথে এসো।" খরগোশটি শেয়ালটিকে নিয়ে গুহার ভিতর গেলো, কিছুক্ষণ পর একা ফিরে এলো এবং আবার ল্যাপটপে কাজ করতে শুরু করলো। একটু পর এক নেকড়ে আসলো ...।

নেকড়ে একই রকম প্রশ্ন কোরল। নেকড়ে খাওয়ার থিসিসের কথা শুনে সেও আগের শেয়ালের মত অবাক হোল। চালাক খরগোশ নতুন নেকড়েকেও গুহায় নিয়ে গেল এবং একা বের হয়ে এল। সর্বশেষ এলো একটি বেবুন। বেবুনেরও একই প্রশ্ন এবং পরিণতিও একই।

সারা দিন কাজ করে সন্ধায় খরগোশটি ল্যাপটপ বন্ধ করে গুহার ভিতরে গিয়ে দেখলো, গুহার একপাশে শেয়ালের হাড়, আরেক পাশে নেকড়ের হাড়, আরেক দিকে বেবুনের অর্দ্ধাংশ পড়ে আছে, আর একপাশে একটি সিংহ ঘুমিয়ে আছে।

গল্পটি এখানেই শেষ। কিন্তু যদি দেখা যায় কোন দিন সিংহের জন্য খাবার সংগ্রহের কাজ ফুরিয়ে গেলো কিংবা কোনদিন আহার পর্যাপ্ত না মিললো, তাহলে একদিন বেলা শেষে সিংহ খরগোশকেই যদি খেয়ে ফেলে তবে অবাক হওয়ার মত কিছু থাকবে কি?

অনুরূপ বিশ্ব মোড়লরা যখন দেখবে তাদের সামনে ধ্বংস করার মত আর কোন দেশ নেই, তখন সৌদি আরব কি তাদের থাবা থেকে বাদ যাবে? বিশ্ব মোড়লরা যুদ্ধের মাঝে আনন্দ পায়। তারা যুদ্ধ ছাড়া একদিন থাকতে চাইবে না। যুদ্ধ তাদের কাছে একটা ক্রীড়া, ইংরেজিতে একে ব-লে War Game.

এমামুয্যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নীর লেখা থেকে

সার্বভৌমত্ব কি?

মানুষ সামাজিক জীব, কাজেই একটা জীবন-ব্যবস্থা ছাড়া সে পৃথিবীতে বসবাস কোরতে পারে না। এবং সেই জীবনব্যবস্থা হলো দীন। সুতরাং সেই জীবন-ব্যবস্থা বা দীনের আইন-কানুন, দণ্ডবিধি, অর্থনীতি, সমাজবিধি সবই থাকতে হবে। এবং এর একটা সার্বভৌমত্বও অবশ্যই থাকতে হবে; সার্বভৌমত্ব ছাড়া তা চোলতেই পারবে না। সার্বভৌমত্বই হোচ্ছে সকল প্রকার জীবনব্যবস্থার ভিত্তি। যখনই আইন, দণ্ডবিধি, অর্থনীতি বা যে কোন ব্যাপারেই কোন সিদ্ধান্ত নিতে হবে তখনই একটা সার্বভৌমত্বের প্রয়োজন হবে। উদাহরণ:

সমাজে অপরাধ দমনের জন্য নরহত্যার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড হওয়া উচিৎ কিনা। কিংবা সমাজের সম্পদ সঠিক এবং সুষ্ঠু বিতরণের জন্য অর্থনীতি সুদ ভিত্তিক হওয়া সঠিক কিনা। সমাজের নেতারা যদি ঐসব বিষয়ে আলোচনা, পরামর্শ, যুক্তি-তর্ক করেন তবে তা অনন্তকাল ধরে চোলতে থাকবে- কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যাবে না। কারণ এসব বিষয়ে প্রত্যেকেরই মতামত আছে। একদল বোলবেন নরহত্যার অপরাধে মৃত্যুদণ্ড আইন না কোরলে সমাজে নরহত্যা থামবে না, বাড়বে; আরেকদলের মত এই হবে যে, মৃত্যুদণ্ড বর্বরোচিত, নৃশংসতা- এ কখনো আইন হোতে পারে না; আরেক দল হয়তো এই মত দিবেন যে, একটি নরহত্যার জন্য মৃত্যুদণ্ড না দিয়ে একাধিক নরহত্যার জন্য মৃত্যুদণ্ড আইন করা হোক। একাধিক অর্থে কয়টি নরহত্যা কোরলে মৃত্যুদণ্ডদেয়া হবে, দুইটি না একশ'টি তাও প্রশ্ন হোয়ে দাঁড়াবে। এবং এ বিতর্ক অনন্তকাল চোলতে থাকবে।

অনুরূপভাবে সমাজের অর্থনীতি সুদ-ভিত্তিক হওয়া সঠিক না লাভ-লোকসান ভিত্তিক হওয়া উচিৎ এ নিয়ে বিতর্কের কোনদিন অবসান হবে না যদি না সিদ্ধান্ত নেবার মত একটা ব্যবস্থা না থাকে। কাজেই যে কোন জীবন-ব্যবস্থায়ই শেষ সিদ্ধান্ত নেবার জন্য একটি স্থান থাকতেই হবে। অন্যথায় জীবন-ব্যবস্থার যে কোন ব্যাপারে পরামর্শ আলোচনায় বোসলে তা অনন্তকাল চোলতে থাকবে। এই শেষ সিদ্ধান্ত নেবার ও দেবার কর্তৃত্ব ও অধিকারই হোচ্ছে সার্বভৌমত্ব। এই সার্বভৌমত্ব হোতে পারে মাত্র ২ প্রকার। যিনি সৃষ্টি কোরেছেন তাঁর, অর্থাৎ স্রষ্টার; কিংবা সৃষ্টের অর্থাৎ মানুষের। স্রষ্টা অর্থাৎ আল্লাহ্ মানুষের জন্য একটা জীবন-ব্যবস্থা দিয়েছেন যাকে তিনি বোলেছেন দীন, সুতরাং তিনি নিজেই সেটার সার্বভৌম। ঐ দীনের মধ্যেই তিনি মানুষের জীবনে যা কিছু প্রয়োজন আইন- কানুন, দণ্ডবিধি, অর্থনীতি, সমাজ-নীতি, শিক্ষা, এক কথায় ব্যক্তি, পরিবার, গোষ্ঠী, জাতি যে কোন পর্যায়ে অবিচার, অশান্তি, অন্যায় অপরাধহীন একটা সমাজ গঠন কোরে সেখানে বাস করার জন্য সিদ্ধান্ত দিয়ে দিয়েছেন। মানুষ যদি স্রষ্টার ঐ সিদ্ধান্ত অর্থাৎ আদেশগুলি মেনে নিয়ে সেই মোতাবেক তার ব্যক্তিগত, সামাজিক ও জাতীয় জীবন পরিচালিত করে তবেই সে আল্লাহ্র সার্বভৌমত্বকে মেনে নিল। আর যদি সে আল্লাহ্র দেয়া সিদ্ধান্তগুলিকে অস্বীকার করে তবে তাকে অতি অবশ্যই অন্য একটি জীবন-ব্যবস্থা অর্থাৎ দীন তৈরি কোরে নিতে হবে, কারণ একটা জীবন-ব্যবস্থা ছাড়া মানুষ পৃথিবীতে বাস কোরতে পারে না। তা অসম্ভব। এই নতুন জীবন-ব্যবস্থা তৈরি কোরতে গেলেই সেখানে অতি অবশ্যই একটা শেষ সিদ্ধান্তের স্থান, অধিকার থাকতে হবে; এবং যেহেতু স্রষ্টার সাবভৌমত্বকে ত্যাগ করা হলো সেহেতু এই শেষ সিদ্ধান্তের স্থান, কর্তৃত্ব, অধিকার (Authority) হোতে হবে সৃষ্টির অর্থাৎ মানুষের।

মোসলেম নামধারী জনসংখ্যাসহ সমগ্র মানবজাতি, আজ স্রষ্টার আল্লাহ্র সার্বভৌমত্ব (উলুহিয়াহ্) ত্যাগ কোরে মানুষের সার্বভৌমত্বকে গ্রহণ কোরেছে। এই দুই সার্বভৌমত্ব বিপরীতমুখী, একটি স্রষ্টার, অন্যটি সৃষ্টের; এ দু'টি পরস্পর সাংঘর্ষিক। আল্লাহ্র সার্বভৌমত্বের ওপরই এসলাম প্রতিষ্ঠিত, এই সার্বভৌমত্ব ছাড়া কোন এসলাম নেই। আল্লাহ্র এই সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে ইহুদি-খ্রিস্টান সভ্যতা অর্থাৎ দাজ্জাল আজ দাঁড়িয়েছে সৃষ্টির অর্থাৎ মানুষের সার্বভৌমত্বের প্রতিভূ, প্রতিনিধি হোয়ে। হওয়ার কথা ছিল এই যে, 'লা এলাহা এল্লা আল্লাহ্' অর্থাৎ আল্লাহ্র সার্বভৌমত্বে বিশ্বাসের দাবিদার 'মোসলেম' বোলে পরিচিত এই জনসংখ্যা নিজেদের সর্বপ্রকার বিভেদ ভুলে যেয়ে মানুষের সার্বভৌমত্বের প্রতিনিধি দাজ্জালের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো। দুর্ভাগ্যক্রমে তা তো হয়ই নাই বরং এই 'লা এলাহা এল্লা আল্লাহ্' যেকেরকারী, নামাজ, রোজা, হজ্বব্রত পালনকারী মোসলেম হবার দাবীদার জনসংখ্যা প্রায় সবটাই হয় গণতন্ত্র, না হয় রাজতন্ত্র, না হয় সমাজতন্ত্র, না হয় একনায়কতন্ত্রের কোন না কোনটা মেনে নিয়ে দাজ্জালের পায়ে সাজদায় প্রণত হোয়ে আছে।

এর কারণ বর্তমান দুনিয়াতে যে এসলামটি চালু আছে তাতে এই আল্লাহর সার্বভৌমত্ব অর্থাৎ তওহীদ নেই। তওহীদহীন এসলাম মানেই প্রাণহীন, আত্মাহীন জড়বস্তু। আল্লাহকে মানুষের এলাহর আসন থেকে সোরিয়ে সেখানে পাশ্চাত্য 'সভ্যতা'-কে অর্থাৎ মানুষকে বোসিয়ে যে আনুষ্ঠানিকতাসর্বস্ব ধর্ম পালন করা হোচ্ছে তা আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। আমরা আমাদের বৃহত্তর ও সমষ্টিগত জীবনে গায়রুল্লাহর সার্বভৌমত্বকে স্বীকার ও

আসুন সিস্টেমটা পাল্টাই

গ্রহণ কোরে নিয়ে শুধুমাত্র ব্যক্তিজীবনের সার্বভৌমত্বটুকু আমরা আল্লাহর জন্য রেখেছি। সেই জাল্লে-জালাল, আযিজুল জব্বার, স্রষ্টা ভিক্ষুক নন যে তিনি এই ক্ষুদ্র তওহীদ গ্রহণ কোরবেন। তাছাড়া ওটা তওহীদই নয়, ওটা শেরক ও কুফর। পরিষ্কার কোরে উপস্থাপন কোরতে গেলে এমনি কোরে কোরতে হয়:

ব্যবস্থা (System)	সার্বভৌমত্ব (Sovereignty)
রাজতন্ত্র	রাজা, বাদশাহ, সম্রাট
গণতন্ত্র	জনসাধারণের সংখ্যাগরিষ্ঠতা
সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদ	জনসাধারণের একটি বিশেষ শ্রেণী
ফ্যাসিবাদ	এক নায়ক, ডিকটেটর
এসলাম	আল্লাহ।

এই বিন্যাসই এ কথা পরিষ্কার কোরে দিচ্ছে যে সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে কোন আপোষ সম্ভব নয়। ওপরের যে কোন একটাকে গ্রহণ কোরতে হবে। আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে বাদ দিয়ে অন্য যে কোনটি স্বীকার, গ্রহণ কোরে নিলে সে আর মোসলেম বা মো'মেন থাকতে পারে না। কোন লোক যদি ব্যক্তিগত জীবনে আল্লাহ বিশ্বাসী এবং জাতীয় জীবনের ওপরের যে কোনটায় বিশ্বাসী হয় তবে সে মোশরেক। আর উভয় জীবনেই কোন লোক যদি আল্লাহর সার্বভৌমত্ব বাদে ঐগুলির যে কোনটায় বিশ্বাস করে তবে সে কাফের। তাই এই মোসলেম দাবিদার জনসংখ্যাটি তাদের জাতীয় জীবনে কেউ সমাজতন্ত্র, কেউ রাজতন্ত্র, কেউ একনায়কতন্ত্র ইত্যাদি তন্ত্র-মন্ত্র, ism, cracy ইত্যাদি মেনে চোলছে অর্থাৎ আল্লাহর সার্বভৌমত্ব বাদ দিয়ে ঐ সমস্ত তন্ত্রমন্ত্রের সার্বভৌমত্ব মানছে, এভাবে তারাও কার্যতঃ (Defacto) মোশরেক ও কাফেরে পরিণত হোয়েছে। কাজেই এই জাতির পরিণতি দুনিয়ায় এই লাঞ্ছনা, অপমান, গোলামী আর পরকালে তাদের জন্য অপেক্ষা কোরছে ভয়াবহ জাহান্নাম।

হেযবুত তওহীদের বিরুদ্ধে আবারও অপপ্রচার শুরু হোয়েছে

মো: মসীহ উর রহমান, আমীর, হেযবুত তওহীদ

গতকাল ২৫ আগস্ট এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে হেযবুত তওহীদের আমীর মোঃ মসীহ উর রহমান বলেন, আমরা সম্প্রতি লক্ষ্য কোরছি কয়েকটি চিহ্নিত এসলাম-বিদ্বেষী মিডিয়া আবারও সুপরিকল্পিতভাবে হেযবুত তওহীদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন বানোয়াট, মিথ্যা, ভিত্তিহীন ও আজগুবি সংবাদ প্রকাশ কোরে যাচ্ছে। সংবাদগুলিতে তারা হেযবুত তওহীদকে জঙ্গী, সন্ত্রাসী, গোপন, উগ্র ইত্যাদি আখ্যা দিয়ে এবং বিভিন্ন নিষিদ্ধ সংগঠন, রাজনৈতিক সংগঠন ও জঙ্গী তৎপরতার সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে জড়িয়ে মিথ্যাচার কোরে যাচ্ছে। গত ১৮ বছর থেকেই তারা এ জাতীয় অপপ্রচার চালিয়ে এসেছে, এতে কোরে হেযবুত তওহীদের সদস্যরা ব্যাপক হয়রানির শিকার হোলেও এ আন্দোলন অত্যন্ত ধৈর্য্যের সঙ্গে প্রতিষ্ঠার শুরুতে মাননীয় এমামুয্যামান যে মূলনীতিগুলি ঠিক কোরেছিলেন সেই মূলনীতি অনুসরণ কোরে আইন-শৃঙ্খলার মধ্যে থেকেই মানবজাতিকে প্রকৃত এসলামের দিকে আহ্বান কোরে যাচ্ছে। আমাদের মূলনীতিগুলি হোচ্ছে:

১. হেযবুত তওহীদ চেষ্টা কোরবে আল্লাহর রসুলের প্রতিটি পদক্ষেপকে অনুসরণ কোরতে।

২. হেযবুত তওহীদের কোন গোপন কার্য্যক্রম থাকবে না, সবকিছু হবে প্রকাশ্য এবং দিনের আলোর মত পরিষ্কার।

৩. হেযবুত তওহীদের কেউ কোন আইনভঙ্গ কোরবে না, অবৈধ অস্ত্রের সংস্পর্শে যাবে না, গেলে তাকে এমাম নিজেই আইন প্রয়োগকারী সংস্থার হাতে তুলে দেবেন।

৪. যারা হেযবুত তওহীদের সদস্য নয়, তাদের থেকে কোনরূপ অর্থ গ্রহণ করা হবে না।

৫. হেযবুত তওহীদের কোন সদস্য কোন প্রচলিত রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত হোতে পারবে না।

মানবজাতির কল্যাণে ব্রত, ন্যায়নিষ্ঠ আন্দোলন হেযবুত তওহীদ আল্লাহর রহমে এমামুয্যামানের এই নীতিগুলি অক্ষরে অক্ষরে পালন কোরে যাচ্ছে। গত ১৮ বছরে হেযবুত তওহীদের কোন সদস্য একটিও আইনভঙ্গ করে নি, একটিও অপরাধ করে নি। এটা আমাদের দাবি নয়, এটি আদালতের রেকর্ড, যে কেউ চাইলে যাচাই কোরে দেখতে পারেন। যে আন্দোলনটি সকল প্রকার ধর্মব্যবসার বিরুদ্ধে, ধর্মকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহারের বিরুদ্ধে, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সোচ্চার, সেই হেযবুত তওহীদের বিরুদ্ধে এমন প্রোপাগান্ডার উদ্দেশ্য আমরা মনে কোরি ধর্মজীবী এবং সত্যিকার জঙ্গীদের আড়াল করার অপচেষ্টা মাত্র।

আমরা সকলের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি, আপনারা হেযবুত তওহীদের বিরুদ্ধে কোনরূপ অপপ্রচারে কান না দিয়ে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ কোরুন, আমাদের বই পত্র ও বক্তব্য সর্বত্র পাওয়া যাচ্ছে। বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকসহ অনেক আঞ্চলিক পত্রিকায় আমাদের লেখা, বিবৃতি নিয়মিত প্রকাশিত হোচ্ছে। সেখানে আমাদের যোগাযোগের ঠিকানা, ফোন নম্বর সবকিছু পরিষ্কারভাবে দেওয়া আছে। কাজেই এক শ্রেণীর এসলাম-বিদ্বেষী গণমাধ্যমের অপপ্রচারের ব্যাপারে সচেতন হোন। (বিজ্ঞপ্তি)

চলমান সঙ্কট ও আসন্ন ধ্বংস থেকে মানবজাতির বাঁচার একমাত্র পথ

মানুষ এতটাই আত্মাহীন ও আত্মকেন্দ্রীক হোয়ে পড়েছে যে, যে যাকে যেভাবে পারছে প্রতারণা কোরে, পদপিষ্ঠ কোরে নিজের স্বার্থ চরিতার্থ কোরছে। আমাদের চারপাশে এমন একটি বিষয় বা জিনিসও অবশিষ্ট নেই যাতে মিথ্যা মিশ্রিত নেই। বাতাস, পানি পর্যন্ত বিষাক্ত হোয়ে গেছে। ন্যূনতম মনুষ্যত্ব না থাকায় তারা খাদ্যে বিষ মেশাচ্ছে, ঔষধে পর্যন্ত ভেজাল দিচ্ছে। মানুষ এমন এক দানবে পরিণত হোয়েছে যে চার বছরের শিশুও তাদের হাত থেকে রেহাই পাচ্ছে না। দুর্বলের ওপর সবলের অত্যাচারে, দরিদ্রের ওপর ধনীর বঞ্চনায়, শোষণে, শাসিতের ওপর শাসকের অবিচারে, সরলের ওপর ধুর্তের প্রতারণায় পৃথিবী আজ মানুষের বাসের অযোগ্য হোয়ে পড়েছে। শান্তি রক্ষার জন্য বিভিন্ন সংস্থা তৈরী কোরে, বিভিন্ন নামে আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী আধুনিক অস্ত্র-শস্ত্র ও প্রযুক্তিতে সমৃদ্ধ হোয়ে আপ্রাণ চেষ্টা কোরে যাচ্ছে। একটার পর একটা আইন কোরে, জীবন-ব্যবস্থা পরিবর্তন কোরে যাচ্ছে কিন্তু কিছুতেই বন্ধ করা যাচ্ছে না হত্যা, ধর্ষণ, বেকারত্ব, রাজনৈতিক হানাহানি, দারিদ্র্য, সন্ত্রাস ও যুদ্ধের তাণ্ডব। একটি সমস্যারও সমাধান হোচ্ছে না, বরং দিন দিন নতুন নতুন সমস্যায় আক্রান্ত হোচ্ছে মানুষ। বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে মানব সভ্যতার এই ভয়াবহ বিপর্যয়ের কথা বলা হোয়েছে। আল্লাহর রসুল বোলেছেন, এমন অশান্তি (ফেতনা-*Great Tribulation)* সৃষ্টি হবে যে মানুষ মাটির উপরে থাকার চাইতে মাটির নিচে থাকাকে বেশী পছন্দ কোরবে (হাদীস-মোসলেম), মানুষ মানুষকে বিনা কারণে হত্যা কোরবে, যে নিহত হবে সে জানবে না কেন সে মরল, আবার যে হত্যা কোরবে সেও জানবে না কেন সে হত্যা কোরল। হত্যাকারী ও নিহত উভয়েই জাহান্নামে প্রবেশ কোরবে (হাদীস-মোসলেম)। বৌদ্ধধর্মে বলা হোয়েছে, 'মারণাস্ত্র, রোগ এবং ক্ষুধার্ত মানুষের সংখ্যা প্রচুর হবে *[Ruling Your World by Sakyong Mipham, pg. 44]* সনাতন ধর্মে এই সময়কে বলা হোয়েছে **'ঘোর কলি।'** দুনিয়াময় ছড়িয়ে পড়া এই নৈরাজ্য ও হানাহানির চূড়ান্ত রূপকেই বাইবেলে বলা হোয়েছে *Armageddon, Apocalypse (Revelation 16:12-16)* ইত্যাদি। এই সব ভবিষ্যদ্বাণী নিয়ে অনেক বড় বড় বই লেখা হোয়েছে, **আমাদের প্রশ্ন হোচ্ছে এ বিপদ থেকে উত্তোরণের উপায় কি?**

> ***মানবজাতির সামনে এখন দু'টি নিশ্চিত ভবিষ্যৎ। একটি হোল, নিজেদের কাজের ফলে যে ধ্বংস তারা নিজেদের জন্য ডেকে এনেছে তাতে তারা পতিত হবেই - যা কেবল সময়ের ব্যাপার। দ্বিতীয়তঃ এই ধ্বংস থেকে বাঁচার জন্য একটা উপায় আল্লাহ দিয়েছেন হেযবুত তওহীদের কাছে, যারা এই উপায়টি গ্রহণ কোরে নেবে তারা রক্ষা পাবে। আর যারা তা গ্রহণ কোরবে না তারা স্বাভাবিকভাবেই ধ্বংস হোয়ে যাবে। যারা বেঁচে যাবে তাদের হাতেই গড়ে উঠবে বর্ণিত শান্তিময় নতুন সভ্যতার পৃথিবী।***

নিশ্চিত ধ্বংসের পথে ধাবমান মানবজাতিকে রক্ষা কোরতে পারেন একমাত্র আল্লাহ। যিনি মানুষের স্রষ্টা, একমাত্র তিনিই জানেন কিভাবে মানুষ এই অনিবার্য্য ধ্বংস থেকে রক্ষা পেতে পারে। **অত্যন্ত আনন্দের সংবাদ এই যে, মহান আল্লাহ মানবজাতিকে তাদের নিজের তৈরী মৃত্যুফাঁদ থেকে কিভাবে উদ্ধার পাওয়া যাবে সে উপায় হেযবুত তওহীদকে দান কোরেছেন।** সেই উপায়টি হোচ্ছে আল্লাহর তওহীদ ভিত্তিক সত্যদীন যা রসুলাল্লাহর হাতে গড়া উম্মতে মোহাম্মদী অর্ধেক পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা কোরে মানবজাতিকে অতুলনীয় শান্তি ও নিরাপত্তার স্বর্ণযুগ উপহার দিয়েছিলো। সেই প্রকৃত এসলাম গত ১৩০০ বছরের কালপরিক্রমায় বিকৃত হোতে হোতে বর্তমানে একেবারে বিপরীতমুখী হোয়ে গেছে। তথাকথিত আলেম শ্রেণী এই বিকৃত এসলামটিকে তাদের রুটি রুজির মাধ্যম বানিয়ে নিয়েছেন। অখণ্ড উম্মতে মোহাম্মদী ফেরকা, মাজহাব, মাসলা মাসায়েল ইত্যাদির কূটতর্ক নিয়ে নিজেদের মধ্যে মারামারি, হানাহানিতে লিপ্ত হোয়ে হাজারো ভাগে বিভক্ত হোয়ে আছে; আরেকটি অংশ এসলামের নামে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড কোরে মানুষকে এসলামের বিষয়ে বীতশ্রদ্ধ কোরে তুলেছে। জাতির বৃহত্তম অংশটি শুধুমাত্র তাদের ব্যক্তিগত জীবনে ঐ বিকৃত ধর্মের আনুষ্ঠানিকতা কোরে যাচ্ছে। এর কোনটাই আল্লাহ, রসুলের প্রকৃত এসলাম নয়, কেননা এসলাম শব্দের আক্ষরিক অর্থই শান্তি। অর্থাৎ

যারা এসলামের অনুসারী হবে তারা শান্তিতে থাকবে। কিন্তু বাস্তব অবস্থা ঠিক এর বিপরীত। সেই হারিয়ে যাওয়া প্রকৃত এসলাম মহান আল্লাহ আবার দয়া কোরে টাঙ্গাইলের ঐতিহ্যবাহী পন্নী পরিবারের সন্তান এমামুয্যামান, *The leader of the time* জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নীকে বুঝিয়ে দিয়েছেন। তাঁর পক্ষ থেকে হেযবুত তওহীদ মানবজাতিকে বোলছে, "এই অশান্তিময় অবস্থা ও আসন্ন বিপদ থেকে রক্ষা পেতে সকলে ঐক্যবদ্ধভাবে আল্লাহকে জীবনের একমাত্র এলাহ, হুকুমদাতা হিসাবে মেনে নেওয়া ছাড়া আর বিকল্প নাই।" এটাই আমাদের মূল কথা। **আল্লাহ সমস্ত মানবজাতির উদ্ধারকর্তা হিসেবে হেযবুত তওহীদকে মনোনীত কোরেছেন, মানবজাতিকে এই অবস্থা থেকে উদ্ধার করার সমাধান আল্লাহ হেযবুত তওহীদের কাছেই দিয়েছেন।** গত ২ ফেব্রুয়ারী ২০০৮ ঈসায়ী তারিখে একসঙ্গে অনেকগুলি মো'জেজা (অলৌকিক ঘটনা) ঘোটিয়ে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন যে হেযবুত তওহীদ দিয়েই তিনি সমস্ত দুনিয়াতে তাঁর সত্যদীন প্রতিষ্ঠা কোরবেন। সুতরাং শীঘ্রই পরিবর্তন ঘোটতে যাচ্ছে এই শ্বাসরুদ্ধকর বিশ্বব্যবস্থার। অন্ধকারের পর্দা ভেদ কোরে উঁকি দিচ্ছে এক নতুন সভ্যতা। সেই সভ্যতার রূপরেখা ইতিমধ্যেই মহান আল্লাহ হেযবুত তওহীদকে দান কোরেছেন যা বাস্তবায়িত হোলে বিশ্বে থাকবে না কোন মারামারি, অন্যায়, অবিচার, যুদ্ধ, রক্তপাত, এক কথায় অশান্তি। সাদা-কালো, তামাটে সমস্ত বনি আদম হবে একটি জাতি, এক পরিবার। একটি মানুষ ইচ্ছা কোরলে পৃথিবীর যে কোন স্থানে ভ্রমণ কোরতে পারবে, কেউ তাকে বাধা দিবে না। পৃথিবীর সকল অনিয়ম দূর হোয়ে প্রকৃতির সর্বত্র যেমন শৃঙ্খলা বিরাজিত তেমনি মানবজীবনের সর্ব অঙ্গনে চূড়ান্ত শৃঙ্খলা ও ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হবে। প্রাকৃতিক নিয়মের সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল কোরে আল্লাহ এই জীবন-ব্যবস্থাটি প্রণয়ন কোরেছেন, তাই এই দীনের এক নাম দীনুল ফেতরাত বা প্রাকৃতিক দীন। আগুন-পানি ইত্যাদি প্রাকৃতিক উপাদানগুলি যেমন পৃথিবীর সকল মানবজাতির জন্য অবশ্য প্রয়োজন এবং সবার উপযোগী, তেমনি এই জীবনব্যবস্থাও পৃথিবীর সর্বত্র প্রযোজ্য, প্রয়োগযোগ্য, গ্রহণযোগ্য ও শান্তিদায়ক। এজন্যই আখেরী নবী মোহাম্মদ (দঃ) এর উপাধি আল্লাহ দিয়েছেন রহমাতাল্লিল আলামীন। তাঁর উপর নাযেলকৃত জীবন-ব্যবস্থা গ্রহণ করার ফলে সমস্ত পৃথিবী হবে আল্লাহর রহমতে পরিপূর্ণ। সেই রহমতের বর্ণনা দিতে গিয়ে আল্লাহর রসুল বোলছেন, আল্লাহ পৃথিবীকে এমন ন্যায় ও শান্তিতে পরিপূর্ণ কোরে দিবেন ঠিক ইতিপুর্বে পৃথিবী যেমন অন্যায় ও অশান্তিতে পরিপূর্ণ ছিল (হাদীস-আবু দাউদ)। কোন দুইজন ব্যক্তির মধ্যেও কোন শত্রুতা থাকবে না (হাদীস-মোসলেম)। ইঞ্জিলে বলা হোয়েছে নেকড়ে ও ভেড়া একত্রে বিচরণ কোরবে *(Isaiah 11:6)*. আর সনাতন ধর্মে একে বলা হোচ্ছে সত্যযুগের পুনরাবর্ত্তন (বিষ্ণু পুরাণ)। **প্রশ্ন হোতে পারে, একদিকে আমরা বোলছি ভয়াবহ ধ্বংস অনিবার্য্য আরেক দিকে জানাচ্ছি নতুন সভ্যতার সুসংবাদ, এর অর্থ কি?** এর অর্থ হোল মানবজাতির সামনে এখন দু'টিই নিশ্চিত ভবিষ্যৎ। একটি হোল, নিজেদের কাজের ফলে যে ধ্বংস তারা নিজেদের জন্য ডেকে এনেছে তাতে তারা পতিত হবেই - যা কেবল সময়ের ব্যাপার। দ্বিতীয়তঃ এই ধ্বংস থেকে বাঁচার জন্য একটা উপায় আল্লাহ দিয়েছেন হেযবুত তওহীদের কাছে, যারা এই উপায়টি গ্রহণ কোরে নেবে তারা রক্ষা পাবে। আর যারা তা গ্রহণ কোরবে না তারা স্বাভাবিকভাবেই ধ্বংস হোয়ে যাবে। যারা বেঁচে যাবে তাদের হাতেই গড়ে উঠবে বর্ণিত শান্তিময় নতুন সভ্যতার পৃথিবী।

পরিশেষে বোলতে চাই, জীবনব্যবস্থা *(System of life)* তো অনেক পরিবর্তন ও প্রয়োগ কোরে দেখা হোল কিন্তু ফল কি হোল তা এখন সবাই দেখতে পাচ্ছেন। এখন বাকি আছে চূড়ান্ত ধ্বংস-আর এই ধ্বংসের হাত থেকে উদ্ধারের কথাই আমরা বোলছি। তাই অন্ততঃ বাঁচার জন্য আল্লাহর সত্যদীন গ্রহণ কোরে নিন। সেটা কোথায় পাবেন? পাবেন একমাত্র হেযবুত তওহীদের কাছে। কাজেই আল্লাহর উপর ভরসা কোরে আমরা বোলতে পারি, মানবজাতিকে বাঁচতে হোলে হেযবুত তওহীদে আসতেই হবে, আর তা না হোলে চূড়ান্তভাবে ধ্বংস হোতেই হবে। এখন শুধু অপেক্ষা।

এমামুয্‌যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নীর লেখা থেকে

মোসলেম নামক জনগোষ্ঠী তওহীদে নেই

আল্লাহ তার প্রতিভূ আদমকে (আ:) সৃষ্টি কোরে তার স্ত্রীসহ পৃথিবীতে পাঠানোর সময় বোলে দিলেন- যাও, ওখানে বংশ বৃদ্ধি কর। তোমরা ওখানে তোমাদের সামগ্রিক জীবন কেমন কোরে পরিচালিত কোরলে অন্যায়-অবিচার, রক্তপাতহীন অবস্থায় বাঁচতে পারবে সে পথ প্রদর্শন আমি নিশ্চয়ই পাঠিয়ে দেব (কোর'আন- সূরা আল বাকারা ৩৮)। অর্থাৎ মানুষকে শান্তিতে থাকতে হোলে যে রকম জীবন-ব্যবস্থায় থাকতে হবে সে ব্যবস্থা প্রণয়নের ভার তিনি নিজে নিলেন। স্রষ্টা যে কাজের দায়িত্ব নিলেন তাতে যে তিনি ব্যর্থ হবেন না, তা স্বাভাবিক। পৃথিবীতে পাঠিয়ে দেবার পর তাঁর সৃষ্টি আদমকে (আ:) দিলেন তাঁর জীবন-ব্যবস্থা। আমরা ধোরে নিতে পারি এ ব্যবস্থা ছিলো ছোট, সংক্ষিপ্ত- কারণ তখন অল্প সংখ্যক নর-নারীর জন্যই ব্যবস্থা দিতে হোয়েছিলো। আদম (আ:) এবং তার পুত্র কন্যা ও নাতি-নাতনিদের জন্য এবং সমস্যাও নিশ্চয়ই ছিলো সীমিত। কিন্তু তারপর আল্লাহর হুকুম মোতাবেক বংশবৃদ্ধি চোললো। সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে আদমের (আ:) সন্তানরা ক্রমে ক্রমে পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়লো, ফলে একে অন্য থেকে বিচ্ছিন্ন হোয়ে পড়লো। স্রষ্টা কিন্তু তাঁর দায়িত্ব ভুলেন নি। বনি-আদমের বিভিন্ন, বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীতে তিনি তার প্রেরিত পাঠিয়ে তাদের জন্য জীবনব্যবস্থা পাঠাতে থাকলেন- যে ব্যবস্থা অনুসরণ কোরলে তারা নিজেদের মধ্যে অশান্তি, ফাসাদ, রক্তপাত না কোরে শান্তিতে, এসলামে, বাস কোরতে পারে। এদিকে ইবলিস অর্থাৎ শয়তানও ভুললো না তার প্রতিশ্রুত কাজ। সেও প্রতিটি বনি-আদমের দেহ-মনের মধ্যে বোসে তাকে নানা রকম বুদ্ধি পরামর্শ দিতে থাকলো, নতুন নতুন উপায় বাতলাতে থাকলো যাতে মানুষ আল্লাহর দেয়া জীবন-ব্যবস্থাকে অস্বীকার করে, অন্ততঃ পক্ষে বিকৃত করে; এবং ফলে সেই অন্যায়, ফাসাদ আর রক্তারক্তিতে জড়িত হোয়ে পড়ে। যখনই ইবলিস কোন জন সমাজে সফল হোয়েছে তখনই আল্লাহ সেখানে নতুন একজন প্রেরিত পাঠিয়েছেন সেটাকে সংশোধন কোরতে (কোর'আন- সূরা আন নহল ৩৬)।

এখন দেখা দরকার যে, বিভিন্ন নবীদের মাধ্যমে, পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায়, বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর জন্য আল্লাহ যে জীবনব্যবস্থা পাঠালেন সেটা মূলতঃ কি? পর্যবেক্ষণ কোরলে দেখা যায় এর মূল ভিত্তি হোচ্ছে- স্রষ্টাকে, আল্লাহকে একমাত্র প্রভু, শুধু একমাত্র প্রভু নয়, সর্বময় প্রভু বোলে স্বীকার ও বিশ্বাস করা। এই ব্যাপারে তিনি নিজের সম্বন্ধে যে শব্দটি ব্যবহার কোরেছেন সেটা হলো 'এলাহ'। বর্তমানে এর অনুবাদ করা হয় 'উপাস্য' শব্দ দিয়ে। এই উপাস্য শব্দ দিয়ে এর অনুবাদ হয় না। কারণ হোচ্ছে এই যে বর্তমানে পৃথিবীর প্রতিটি ধর্ম প্রায় সম্পূর্ণভাবে বিকৃত হোয়ে গেছে। যার একটা বিকৃতি হলো আল্লাহর দেয়া বিধান থেকে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি জাতীয় ব্যাপারগুলো সম্পূর্ণভাবে বাদ দিয়ে শুধু ব্যক্তিগত ব্যাপারগুলিতে সীমাবদ্ধ কোরে রাখা; এবং আনুষ্ঠানিক উপাসনা তার অন্যতম। **শুধু 'এলাহ' শব্দ আল্লাহ এ অর্থে ব্যবহার করেন নি। তিনি যে অর্থে ব্যবহার কোরেছেন তার অর্থ হল- যার বিধান এবং নির্দেশ জীবনের**

প্রতি ক্ষেত্রে, প্রতি ব্যাপারে অলংঘনীয়। আদম (আ:) থেকে মোহাম্মদ (দ:) পর্য্যন্ত প্রত্যেক নবীর সময় এই বিশ্বাসের মূলমন্ত্র রাখা হোয়েছে-একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কোন এলাহ নেই (লা এলাহা এল্লাল্লাহ) - এবং পরে যোগ হোয়েছে তদানিন্তন নবীর নাম। এই কলেমায় মূলমন্ত্রে কখনো এই এলাহ শব্দ ছাড়া অন্য কোন শব্দ স্রষ্টা ব্যবহার করেন নি। কখনো কোন নবীর সময় লা রব্ব এল্লাল্লাহ বা লা মালেক এল্লাল্লাহ বা তার নিরানব্বই নামের যে কোনটা হোতে পারতো। কিন্তু তিনি তার লক্ষাধিক নবীর- কোন নবীর সময়ের কালেমাতেই ঐ এলাহ ছাড়া অন্য কোন নাম ব্যবহার করেন নি। কেন? **এই জন্য যে তিনি 'একমাত্র' যার আদেশ নিষেধ ছাড়া আর কারো আদেশ নিষেধ গ্রাহ্য নয়।** অর্থাৎ কেউ যদি কতগুলি আদেশ নির্দেশ মেনে নিলো কিন্তু অন্য কতকগুলি অস্বীকার করলো, তবে তিনি আর তার একমাত্র এলাহ রোইলেন না। এটা সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত। কারণ যে রকম জীবনব্যবস্থা অনুসরণ কোরলে মানুষ পৃথিবীতে গোলমাল, অশান্তি, অবিচার, অন্যায়, যুদ্ধ ও রক্তপাত করা থেকে অব্যাহতি পাবে সে রকম জীবন-ব্যবস্থায় রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থাই যে মূখ্য ও প্রধান হবে এ কথা সাধারণ বুদ্ধিতেই বোঝা যায়। **তাই আল্লাহ নবীদের মাধ্যমে মানুষের জন্য যে জীবনব্যবস্থা পাঠালেন তার কালেমা, মূলমন্ত্র স্থির কোরে দিলেন- তাকে একমাত্র এলাহ অর্থাৎ বিধানদাতা বোলে স্বীকার করার ভিত্তিতে।**

জীবন-বিধানের এই ভিত্তিটাকে অর্থাৎ আল্লাহর সার্বভৌমত্ব, তওহীদকে স্রষ্টা এত গুরুত্ব দিয়েছেন যে, সেই আদম (আ:) থেকে শুরু কোরে তার শেষনবী মোহাম্মদ (দ:) পর্য্যন্ত প্রত্যেককে পাঠানো হোয়েছে ঐ এক দাবী দিয়ে- আমাকে ছাড়া কাউকে প্রভু বোলে, এলাহ বোলে মানবে না। অন্য কারো দেয়া বিধান, আদেশ-নিষেধ মানবে না। মানলে তাদের আমি কিছুতেই মাফ করবো না। কিন্তু ঐ একটি মাত্র দাবী মেনে নিলে আর কোন গোনাহ পাপের জন্য শাস্তি দেব না (কোর'আন- সূরা আন নিসা ৪৮, ১১০, ১১৬)।

আল্লাহর এই মনোভাবের কারণ, তিনি জানেন তার পাঠানো জীবনব্যবস্থা গ্রহণ না কোরে, নিজেরা তা তৈরী কোরে তা মেনে চোললে তার নিজের হাতে গড়া, তার অতি স্নেহের সৃষ্টি মানুষ অশান্তি আর রক্তপাতে ডুবে থাকবে। তাই তিনি চান মানুষ তার দেয়া জীবনব্যবস্থা মেনে নিয়ে তাদের জীবনে প্রতিষ্ঠা করুক এবং পরিণামে শান্তিতে পৃথিবীতে বসবাস করুক। যেহেতু তাকে একমাত্র প্রভু, এলাহ বোলে স্বীকার ও বিশ্বাস না কোরে নিলে তার পাঠানো জীবনব্যবস্থা গ্রহণ করার কথা ওঠে না, তাই ওর উপর, তওহীদ, সার্বভৌমত্বের উপর এত কড়াকড়ি। **এ কড়াকড়ি আমাদের অশান্তি, অত্যাচার, রক্তারক্তি থেকে বাঁচাবার জন্য ভালবাসার কড়াকড়ি।** আল্লাহকে একমাত্র বিধান দাতা বোলে স্বীকার ও বিশ্বাস কোরে নেয়াই আদম (আ:) থেকে মোহাম্মদ (দ:) পর্য্যন্ত সমস্ত দীনের, ধর্মের ভিত্তি। এই হোচ্ছে দীনুল কাইয়্যেমা, সনাতন ধর্ম, সেরাতুল মোস্তাকীম। **এটা স্বতঃস্ফুর্ত যে, তাকে একমাত্র জীবন-বিধাতা বোলে মেনে নেয়ার পর আর অন্য কারো তৈরী বিধান গ্রহণযোগ্য হোতে পারে না এবং শুধু এইটুকুই তিনি চান আমাদের কাছে।**

এখন দেখা যাক এই যে জীবনব্যবস্থা স্রষ্টা যুগে যুগে পাঠিয়েছেন এটা কি? লক্ষ্য কোরলে দেখা যায় এর ভিত্তি ঐ স্রষ্টার সার্বভৌমত্ব, তওহীদ যা চিরস্থায়ী। অন্যভাগ আদেশ-নিষেধ, যেগুলি মেনে চোললে ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সমষ্টিগতভাবে মানুষ পরিপূর্ণ শান্তিতে, প্রগতিতে বাস কোরতে পারে। এই দ্বিতীয় ভাগটি চিরস্থায়ী, সনাতন নয়, এটি স্থান ও কালের উপর নির্ভরশীল। পৃথিবীর বিভিন্ন জনগোষ্ঠীকে বিভিন্ন সময়ে তিনি তার নবী পাঠিয়ে যে জীবনব্যবস্থা দিয়েছেন তাতে স্বভাবতঃই স্থান, কাল, পাত্র ও সমস্যাভেদে বিভিন্ন নির্দেশ থেকেছে। আর দু'টি ভাগ এতে সব সময় থেকেছে- সেটা উদ্দেশ্য ও প্রক্রিয়ার ভাগ। উদ্দেশ্য সব সময়ই একই থেকেছে-শান্তিতে সুবিচারে বসবাস এবং এ উদ্দেশ্য অর্জন কোরতে যে সমস্ত প্রক্রিয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। এই প্রধান চারটি ভাগকে একত্র কোরে দেখলে পরিস্ফুট হোয়ে উঠবে যে, আল্লাহর দেয়া জীবনব্যবস্থা মানুষের সমগ্র জীবনের প্রতিটি বিষয়বস্তুকে নিয়ন্ত্রণ কোরবে। তা যদি না হতো তবে তা মানুষের জন্য জীবন-বিধান হোতে পারতো না, হোলেও অসম্পূর্ণ ও আংশিক হোত। **অর্থাৎ আল্লাহকে "একমাত্র জীবন-বিধাতা" স্বীকার ও গ্রহণ করার পর জীবনের কোন অঙ্গনে (Facet) অন্য কোন বিধান অর্থাৎ আইন স্বীকার করার অর্থ হলো তাকে ছাড়াও অন্য বিধাতা স্বীকার কোরে নেওয়া-শেরক।** অর্থাৎ তাঁর আদেশ নিষেধ, তার দেয়া জীবন ব্যবস্থা ছাড়া আর কোন কিছু আমরা গ্রহণ কোরি না, মানি না এবং মানা শর্ত্তহীনভাবে, আংশিকভাবে নয়। অমুক অমুক ব্যাপারে মানি আর অমুক ব্যাপারে মানি না, অন্যের আদেশ নিষেধ মানি, অন্যের বিধান মানি, অমন মানা সেই সর্বজ্ঞানী স্রষ্টা গ্রহণ করেন না, অমন আংশিক মানা তার কাছে শেরক, অমার্জনীয় অপরাধ এবং তিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ যে শেরক তিনি কখনই ক্ষমা কোরবেন না। অর্থাৎ এই সহজ সরল সত্যকে গ্রহণ কোরলে বাকি অন্যসব নিজেই স্বতঃস্ফুর্ত্তভাবেই আসবে এবং মানুষের জীবনে সামগ্রিকভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠা হবে। কিন্তু ঐ গ্রহণ যদি পরিপূর্ণভাবে না হয়, আংশিক হয়, জাতীয় জীবনে না হোয়ে যদি শুধু ব্যক্তিগত জীবনে হয়, তবে তা মানব জীবনে শান্তি আনতে পারবে না। কারণ আইন-কানুন দণ্ডবিধির প্রভাবেই শান্তি শৃঙ্খলা ও আইনের শাসন সম্ভব, ব্যক্তিগতভাবে অসম্ভব। এই জন্যই হাদীসে পাই রসুলাল্লাহ (দ:) বোলেছেন- **যে মানুষ আল্লাহ ছাড়া আর কোন এলাহ, বিধাতা নেই এই বিশ্বাস নিয়ে যাবে সে জান্নাতবাসী হবে।** মহানবীর (দ:) এই কথা শুনে আবু যার (রা:) জিজ্ঞাসা কোরলেন, যদি ঐ লোক ব্যভিচার করে এবং চুরি করে? আল্লাহর রসুল (দ:) জবাব দিলেন, সে ব্যভিচার ও চুরি কোরলেও। বিশ্বনবীর (দ:) এই কথা স্পষ্টতই আবু যারকে (রা:) বিস্মিত কোরেছিলো। কারণ তিনি আবার তাকে প্রশ্ন কোরলেন, সে

আজকের 'মুসলিম' জাতি দীনের সমস্ত খুঁটিনাটি অতি যত্নের সাথে পালন করে কিন্তু আসল ভিত্তি সেই তওহীদে নেই। মরা গাছের শুকনো পাতায় তারা অতি সতর্কতার সাথে সারাদিন পানি ঢালছেন ওদিকে গাছের শেকড় আর গুড়ি যে মরে গেছে তা তাদের জানা নেই। আজ এই উম্মাহ পাশ্চাত্যের ধ্যানধারণা, জীবনব্যবস্থা, সংস্কৃতি সবকিছুকে এমনভাবে তসলিম কোরে নিয়েছে, স্বীকার কোরে নিয়েছে যে, তাদের ব্যক্তিগত ধর্মীয় কাজের বিধাতা হোচ্ছেন আল্লাহ আর জাতীয় অর্থাৎ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, বিচার, দণ্ডবিধি ইত্যাদির বিধাতা, এলাহ হোচ্ছে পাশ্চাত্যের ইহুদী-জুডিও খ্রীস্টান, সভ্যতা।

ব্যভিচার ও চুরি কোরলেও? হাদীসে পাই বিস্মিত আবু যার (রা:) তিন তিন বার বিশ্বনবীকে (দ:) ঐ একই প্রশ্ন কোরেছিলেন এবং শেষ বার একেবারে নিঃসন্দেহ, নিশ্চিত কোরে দেবার জন্য আল্লাহর রসুল (দ:) "হ্যাঁ ব্যভিচার ও চুরি কোরলেও" এই কথা বোলে যোগ কোরেছিলেন "আবু যারের নাক কেটে দিলেও" এই হাদীসটি 'মুত্তাফিক আলাইহে' শ্রেণীভুক্ত অর্থাৎ বোখারী ও মুসলিম উভয় শ্রেষ্ঠ হাদীসবেত্তা দ্বারা সমর্থিত ও গৃহীত, অর্থাৎ নিঃসন্দেহে সত্য। বর্ত্তমানের অতি মুসলিমদের কাছে বিশ্বনবীর (দ:) ঐ কথা অতি আশ্চর্যজনক বোধ হবে, গ্রহণ কোরতে দ্বিধা আসবে, কারণ তাদের আকীদা বিকৃত হোয়ে গেছে। তারা জাতীয় জীবনে আল্লাহর আইন-কানুন, দণ্ডবিধি, রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক ইত্যাদি সমস্ত ত্যাগ কোরে মানুষের তৈরী ব্যবস্থার মধ্যে, অর্থাৎ **শেরক ও কুফরের মধ্যে নিমজ্জিত হোয়েও মহা নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত, তাহাজ্জুদ, নফল, তারাবী, পাজামা, কুর্ত্তা দাড়ি আর ফতোয়ার কুটতর্কে ব্যস্ত এই বিকৃত মানসিকতা।** আরও অনেকগুলি হাদীসে ওমনি শুধু লা এলাহা এল্লাল্লাহ কে-ই যথেষ্ট বলা হোয়েছে, যেমন জান্নাতের চাবি হোচ্ছে আল্লাহর ছাড়া হুকুমদাতা, এলাহ নেই (মুয়ায বিন জাবাল থেকে আহমদ, মেশকাত)। অন্য এক হাদীসে বলা হোয়েছে, যে লোক বিশ্বাস কোরবে আল্লাহ ছাড়া হুকুমদাতা (এলাহ) নেই এবং মোহাম্মদ (দ:) তার প্রেরিত তার জন্য জাহান্নাম হারাম হোয়ে যাবে (ওবাদাহ বিন সাবেত রা: থেকে মুসলিম, মেশকাত)। সর্বত্রই মনে রাখতে হবে যে, ঐ তওহীদ আজকের এই ব্যক্তিগত আংশিক তওহীদ নয়, ঐ তওহীদ হোচ্ছে সেই তওহীদ যে তওহীদ বিশ্বনবী (দ:) তার উম্মাহকে শিখিয়েছিলেন। সেই তওহীদ আজ বিশ্বের কোথাও নেই। আজকের 'মুসলিম' জাতি দীনের সমস্ত খুঁটিনাটি অতি যত্নের সাথে পালন করে কিন্তু আসল ভিত্তি সেই তওহীদে নেই। **মরা গাছের শুকনো পাতায় তারা অতি সতর্কতার সাথে সারাদিন পানি ঢালছেন ওদিকে গাছের শেকড় আর গুড়ি যে মরে গেছে তা তাদের জানা নেই।** আজ এই উম্মাহ পাশ্চাত্যের ধ্যানধারণা, জীবনব্যবস্থা, সংস্কৃতি সবকিছুকে এমনভাবে তসলিম কোরে নিয়েছে, স্বীকার কোরে নিয়েছে যে, তাদের ব্যক্তিগত ধর্মীয় কাজের বিধাতা হোচ্ছেন আল্লাহ আর জাতীয় অর্থাৎ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, বিচার, দণ্ডবিধি ইত্যাদির বিধাতা, এলাহ হোচ্ছে পাশ্চাত্যের ইহুদী-জুডিও খ্রীস্টান সভ্যতা।

ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে

মাননীয় এমামুয্যামান

মাননীয় এমামুয্যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী করটিয়া, টাঙ্গাইলের ঐতিহ্যবাহী পন্নী পরিবারে ১৯২৫ সনের ১১ মার্চ জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৪২ সনে তিনি মেট্রিকুলেশন পাশ করেন। এরপর সা'দাত কলেজে কিছুদিন অতিবাহিত করার পর দ্বিতীয় বর্ষে তিনি কোলকাতার ইসলামিয়া কলেজে ভর্ত্তি হন। সেখান থেকে তিনি উচ্চ মাধ্যমিক সমাপ্ত করেন।

তেহরীক-এ-খাকসার আন্দোলনের ইউনিফর্ম পরিহিত এমামুয্যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী

কোলকাতায় তাঁর শিক্ষালাভের সময় পুরো ভারত উপমহাদেশ ছিল ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামে উত্তাল আর কোলকাতা ছিলো এই বিপ্লবের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু। আন্দোলনের এই চরম মুহূর্তে তরুণ এমামুয্যামান ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামে পুরোপুরি জড়িয়ে পরেন। সেই সুবাদে তিনি এই সংগ্রামের কিংবদন্তীতুল্য নেতৃবৃন্দের সাহচর্য্য লাভ করেন যাঁদের মধ্যে মহাত্মা গান্ধী, কায়েদে আযম মোহম্মদ আলী জিন্নাহ্, অরবিন্দু বোস, শহীদ হোসেন সোহরাওয়ার্দি, মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদুদী অন্যতম। উপমহাদেশের দু'টি বৃহৎ ও প্রসিদ্ধ দল ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামে নেতৃত্ব দান কোরেছিল যথা- মাহাত্মা গান্ধী ও জওহরলাল নেহেরুর নেতৃত্বে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস এবং মোহম্মদ আলী জিন্নাহ'র নেতৃত্বে সর্বভারতীয় মুসলীম লীগ। কিন্তু এমামুয্যামান এই দু'টি বড় দলের একটিতেও যুক্ত না হোয়ে যোগ দিলেন আল্লামা এনায়েত উল্লাহ খান আল মাশরেকীর প্রতিষ্ঠিত 'তেহরীক এ খাকসার' নামক অপেক্ষাকৃত ছোট একটি আন্দোলনে। আন্দোলনটি অপেক্ষাকৃত ছোট হোলেও অনন্য শৃংখলা ও বৈশিষ্ট্যের কারণে পুরো ভারতবর্ষব্যাপী বিস্তার লাভ কোরেছিলো এবং ব্রিটিশ শাসনের ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছিল। এমামুয্যামান ছাত্র বয়সে উক্ত আন্দোলনে সাধারণ একজন সদস্য হিসেবে যোগদান কোরেও খুব দ্রুত তাঁর চেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ ও পুরাতন নেতাদের ছাড়িয়ে পূর্ববাংলার কমান্ডারের দায়িত্বপদ লাভ করেন। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি দুঃসাহসী কর্মকাণ্ড ও সহজাত নেতৃত্বের গুণে আন্দোলনের কর্ণধার আল্লামা মাশরেকী'র নজরে আসেন এবং স্বয়ং আল্লামা মাশরেকী তাঁকে সমগ্র ভারতবর্ষ থেকে বিশেষ কাজের *(Special Assignment)* জন্য বাছাইকৃত ৯৬ জন 'সালার-এ-খাস হিন্দ' (বিশেষ কমান্ডার, ভারত) এর একজন হিসেবে নির্বাচিত করেন। এটি ব্রিটিশদের ভারতবর্ষ ত্যাগ এবং দেশবিভাগের ঠিক আগের ঘটনা, তখন এমামুয্যমানের বয়স ছিল মাত্র ২২ বছর। দেশ বিভাগের অল্পদিন পর তিনি বাংলাদেশে (তদানিন্তন পূর্বপাকিস্তান) নিজ গ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

আল্লামা এনায়েত উল্লাহ খান মাশরেকী 'খাকসার' আন্দোলন ভেঙ্গে দেওয়ার পর আন্দোলনের এসলামপ্রিয় নিবেদিত প্রাণ কর্মীরা চান আন্দোলনকে বাঁচিয়ে রাখতে। এজন্য তারা ঐক্যবদ্ধ হোয়ে বাংলাদেশে আসেন এবং করটিয়াতে এমামুয্যামানের সঙ্গে সাক্ষাত করেন এবং তাঁকে আন্দোলনের নেতৃত্বভার গ্রহণ করার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ করেন। কিন্তু এমামুময্যামান আর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত হোতে চান না। এরপর বেশ কয়েক বছর তিনি রাজনীতির সংস্রব থেকে বিচ্ছিন্ন হোয়ে নিরিবিলি জীবনযাপন আরম্ভ করেন।

আসুন সিস্টেমটা পাল্টাই

হিন্দু-মুসলমান

কাজী নজরুল এসলাম

কালজয়ী কবি, জাগরণের কবি, মানবতার কবি, সাম্যের কবি, বিদ্রোহী কবি, আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম, যে সমস্ত কবিতা, গান, প্রবন্ধ লিখে গেছেন জাতিকে উদ্দীপ্ত করার জন্য, তা আমাদের কাছে আজ যেন অন্যভাবে ধরা দিয়েছে। মানবতা ভূলুণ্ঠিত এই বিশ্বে তার প্রসঙ্গিকতা নতুনভাবে দেখা দিয়েছে। আমরা বোলেছিলাম, প্রতিদিন জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা বা গল্পের কোন না কোন অংশ পাঠকদের জন্য মর্মকথাসহ তুলে ধরব। আজকে আমরা নজরুলের সেই বিখ্যাত "হিন্দু-মুসলমান" প্রবন্ধটি পাঠকের জন্য ছাপানো হল। এই লেখাটি ১৯৮৩ সালে বাংলা একাডেমী কর্তৃক নজরুল রচনাবলী বইয়ের প্রথম খন্ডের ৭১২ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হোয়েছিল। আমাদের অনুরোধ, পাঠক যেন এই লেখাটুকু খুব মনোযোগ দিয়ে পড়েন এবং হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করেন। কবি কি মহা সত্য কথা বোলতে চেয়েছেন। লেখার পরে এ বিষয়ে আমরা মর্মকথাতে আরো কিছু কথা সংযোজন কোরেছি যেন বিষয়বস্তু আরো স্পষ্ট হয় ।

একদিন গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলোচনা হচ্ছিল আমার, হিন্দু-মুসলমান সমস্যা নিয়ে। গুরুদেব বললেন ঃ দেখ, যে ন্যাজ বাইরের, তাকে কাটা যায়, কিন্তু ভিতরের ন্যাজকে কাটবে কে?

হিন্দু-মুসলমানদের কথা মনে উঠলে আমার বারেবারে গুরুদেবের ঐ কথাটাই মনে হয়। সঙ্গে সঙ্গে এ প্রশ্নও উদয় হয় মনে, যে এ-ন্যাজ গজালো কি করে? এর আদি উদ্ভব কোথায়? ঐ সঙ্গে এটাও মনে হয়, ন্যাজ যাদেরই গজায়– তা ভিতরেই হোক আর বাইরেই হোক– তারাই হয়ে ওঠে পশু। যে সব ন্যাজওয়ালা পশুর হিংস্রতা সরল হয়ে বেরিয়ে আসে বাইরে– শৃঙ্গরূপে, তাদের তত ভয়ের কারণ নেই, যত ভয় হয় সেই সব পশুদের দেখে– যাদের হিংস্রতা ভিতরে, যাদের শিং মাথা ফু'টে বেরোয় নি! শিংওয়ালা গরু-মহিষের চেয়ে শৃঙ্গহীন ব্যাঘ্র-ভল্লুক জাতীয় পশুগুলো বেশী হিংস্র– বেশী ভীষণ। এ হিসেবে মানুষও পড়ে ঐ শৃঙ্গহীন বাঘ-ভালুকের দলে। কিন্তু বাঘ-ভালুকের তবু ন্যাজটা বাইরে, তাই হয়ত রক্ষে। কেননা, ন্যাজ আর শিং দুই-ই ভেতরে থাকলে কী রকম হিংস্র হয়ে উঠতে হয়, তা হিন্দু-মুসলমানের ছোরা-মারা না দেখলে কেউ বুঝতে পারবে না।

যে প্রশ্ন করছিলাম, এই যে ভেতরের ন্যাজ, এর উদ্ভব কোথায়? আমার মনে হয় টিকিতে ও দাড়িতে। টিকিপুর ও দাড়ি-স্থানই বুঝি এর আদি জন্মভূমি। পশু সাজবার মানুষের একি "আদিম" দুরন্ত ইচ্ছা!– ন্যাজ গজাল না ব'লে তারা টিকি দাড়ি জন্মিয়ে যেন সান্তনা পেল!

সে দিন মানব-মনের পশু-জগতে না জানি কী উৎসবেরই সাড়া পড়েছিল, যে দিন ন্যাজের বদলে তারা দাড়ি-টিকির মত কোনো কিছু একটা আবিষ্কার করলে!

মানুষের চিরন্তন আত্মীয়তাকে এমনি ক'রে বৈরিতায় পরিণত করা হ'ল দেওয়ালের পর দেওয়াল খাড়া ক'রে। ধর্মের সত্যকে সওয়া যায়, কিন্তু শাস্ত্র যুগে যুগে অসহনীয় হয়ে উঠেছে, বলেই তার বিরুদ্ধে যুগে যুগে মানুষও বিদ্রোহ করেছে। হিন্দুত্ব মুসলমানত্ব দুই সওয়া যায়, কিন্তু তাদের টিকিত্ব দাড়িত্ব অসহ্য, কেননা ঐ দুটোই মারামারি বাধায়। টিকিত্ব হিন্দুত্ব নয়, ওটা হয়ত পন্ডিত্ব! তেমনি দাড়িও ইসলামত্ব নয়, ওটা মোল্লাত্ব! এই দুই 'ত্ব' মার্কা চুলের গোছা নিয়েই আজ এত চুলোচুলি! আজ যে মারামারিটা বেধেছে, সেটাও এই পন্ডিত মোল্লায় মারামারি, হিন্দু-মুসলমানে মারামারি নয়। নারায়ণের গদা আর আল্লার তলোয়ার কোনো দিনই ঠোকাঠুকি বাঁধবে না, কারণ তাঁরা দুইজনেই এক, তাঁর এক হাতের অস্ত্র তাঁরই আর এক হাতের ওপর পড়বে না। তিনি সর্বনাম, সকল নাম গিয়ে মিশেছে ওঁর মধ্যে। এত মারামারির মধ্যে এইটুকুই ভরসার কথা যে, আল্লা ওর্ফে নারায়ণ হিন্দুও নন মুসলমানও নন। তাঁর টিকিও নেই, দাড়িও নেই। একেবারে "ক্লিন"। টিকি-দাড়ির ওপর আমার এত আক্রোশ এই জন্য যে, এরা সর্বদা স্মরণ করিয়ে দেয় মানুষকে যে, তুই আলাদা আমি আলাদা। মানুষকে তার চিরন্তন রক্তের সম্পর্ক ভুলিয়ে দেয় এই বাইরের চিহ্নগুলো।

অবতার-পয়গাম্বর কেউ বলেন-নি, আমি হিন্দুর জন্য এসেছি, আমি মুসলমানের জন্য এসেছি, আমি ক্রীশ্চানের জন্য এসেছি। তাঁরা বলেছেন, আমরা এস

মানুষের জন্য এসেছি– আলোর মত, সকলের জন্য। কিন্তু কৃষ্ণের ভক্তেরা বললে, কৃষ্ণ হিন্দুর, মুহম্মদের ভক্তেরা বললে, মুহম্মদ মুসলমানদের, খ্রীস্টের শিষ্যেরা বললে, খ্রীস্ট ক্রীশ্চানদের। কৃষ্ণ-মুহম্মদ-খ্রীস্ট হয়ে উঠলেন জাতীয় সম্পত্তি! আর এই সম্পত্তিত্ব নিয়েই যত বিপত্তি। আলো নিয়ে কখনো ঝগড়া করে না মানুষে, কিন্তু গরু-ছাগল নিয়ে করে। বেশ মনে আছে, ছেলেবেলায় আমরা সূর্য নিয়ে ঝগড়া করতাম। এ বলত আমাদের পাড়ার সূর্য বড়; ও বলত আমাদের পাড়ার সূর্য বড়! আমাদের গভীর বিশ্বাস ছিল, প্রত্যেক পাড়ায় আলাদা আলাদা সূর্য ওঠে! স্রষ্টা নিয়েও ঝগড়া চলেছে সেই রকম। এ বলছে আমাদের আল্লা ; ও বলছে আমাদের হরি। স্রষ্টা যেন গুরু-ছাগল! আর তার বিচারের ভার পড়েছে জাস্টিস সার আবদুর রহিম, পন্ডিত মদনমোহন মালব্য প্রভৃতির ওপর! আর বিচারের ফল মেডিক্যাল কলেজ গেলেই দেখতে পাওয়া যাবে!

নদীর পাশ দিয়ে চলতে চলতে যখন দেখি, একটা লোক ডুবে মরছে, মনের চিরন্তন মানুষটি তখন এ-প্রশ্ন করবার অবসর দেয় না যে, লোকটা হিন্দু না মুসলমান। একজন মানুষ ডুবছে, এইটেই হয়ে ওঠে তার কাছে সবচেয়ে বড়, সে ঝাঁপিয়ে পড়ে নদীতে। হিন্দু যদি উদ্ধার করে দেখে লোকটা মুসলমান, বা মুসলমান যদি দেখে লোকটা হিন্দু– তার জন্য ত তার আত্মপ্রসাদ এতটুকু ক্ষুণ্ণ হয় না। তার মন বলে, 'আমি একজন মানুষকে বাঁচিয়েছি– আমারই মত একজন মানুষকে।'

কিন্তু আজ দেখছি কি? ছোরা খেয়ে যখন খায়রু মিয়া পড়ল, আর তাকে যখন তুলতে গেল হালিম, তখন ভদ্র সম্প্রদায় হিন্দুরাই ছুটে আসলেন, "মসাই করেন কি? মোচনমানকে তুলছেন! মরুক ব্যাটা।" তারা 'অজাতশ্মশ্রু' হালিমকে দেখে চিনতে পারেন নি যে সে মুসলমান। খায়রু মিয়ার দাড়ি ছিল। ছোরা খেয়ে যখন ভুজালি সিং পড়ল পথের উপর তাকে তুলতে গিয়ে তুর্কীছাঁট-দাড়ি শশধর বাবুরও ঐ অবস্থা। মানুষ আজ পশুতে পরিণত হয়েছে, তাদের চিরন্তন আত্মীয়তা ভুলেছে। পশুর ন্যাজ গজিয়েছে ওদের মাথার ওপর, ওদের সারা মুখে। ওরা মারছে লুঙ্গিকে, মারছে নেঙ্গোটিকে; মারছে টিকিকে, দাড়িকে। বাইরের চিহ্ন নিয়ে এই মূর্খদের মারামারির কি অবসান নেই!

মানুষ কি এমনি অন্ধ হবে যে, সুনীতি বাবু হ'য়ে উঠবেন হিন্দু-সভার সেক্রেটারী এবং মুজিবর রহমান সাহেব হবেন তঞ্জিম তব্লিগের প্রেসিডেন্ট?...

রাস্তায় যেতে যেতে দেখলাম, একটা বলদ যাচ্ছে, তার ন্যাজটা গেছে খ'সে। ওরই সাথে দেখলাম, আমার অতি বড় উদার বিলেত-ফেরত বন্ধুর মাথায় এক য়্যাব্বড় টিকি গজিয়েছে।

মনে হল, পশুর ন্যাজ খসছে আর মানুষের গজাচ্ছে।

মর্মকথা

উপরোক্ত লেখায় এই উপমহাদেশে হিন্দু-মুসলমান সংঘাতের দাঙ্গার অন্তর্নিহিত কারণ গুলি কি কি তা কবি ক্ষুরধার লেখনিতে অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় ফুটিয়ে তুলেছেন। কবি যে সংকীর্ণতার কথা বলেছেন সেই সংকীর্ণতা থেকে, সেই কুপমন্ডুকতা থেকে, সেই ক্ষুদ্র গণ্ডি থেকে এখনও হিন্দু-মুসলমানেরা বের হোতে পারেন নাই। এখনও ধর্মব্যবসায়ী মোল্লা, ঠাকুর, পুরোহিতদের ধর্ম পরিপন্থি কর্মকাণ্ডে মানবতা লাঞ্ছিত, নিরপরাধ মানুষ আজ বঞ্চিত। মূলতঃ আখেরী নবী, মহানবী মোহাম্মদ (সাঃ) কে আল্লাহ পাঠিয়েছেন সমস্ত মানবতার কল্যাণের জন্য। তিনি এসে এ কথা বলেন নি যে, হে মুসলমান ! আমি তোমাদের নবী। তিনি বোলেছেন, "ইয়া আয়্যুহান নাস"। হে মানুষ! আমি তোমাদের সকলের জন্য আল্লাহর প্রেরিত রসুল। তিনি সমস্ত মানবজাতির জন্য আল্লাহর রসুল। কোরআনে আল্লাহ কোথাও বলেননি, এটা শুধু মুসলমানদের জন্য নাযেল কোরেছি। বোলেছেন, "এই কোরআন সমগ্র মানবজাতির জন্য।" এই জন্য নবী করীম (সাঃ) এর উপাধি হোল রহমাতাল্লিল আলামিন- বিশ্ববাসীর, বিশ্ব জগতের জন্য রহমতস্বরূপ। কাজেই আমাদের কথা হোল স্রষ্টা প্রেরিত মহামানবরা মানবতার কল্যাণেই আবির্ভূত হোয়েছেন। মানবজাতির মুক্তির জন্যই তাদের আগমন। মহাভারতে, আরবে, মহাচীনে, ইহুদী জাতির মধ্যে এক কথায় পৃথিবীর সকল স্থানে যে সকল মহামানব আগমন করেছেন তাদের প্রকৃত শিক্ষা যতদিন ছিল ততদিন মানুষ শান্তিতে ছিল। পরবর্তীতে তাঁদের শিক্ষাকে, তাদের কর্মকে ভুল পথে পরিচালিত করার ফলেই মানুষ অশান্তিতে পতিত হয়েছে। তাঁদের আনীত গ্রন্থগুলিকে বিকৃত করা হোয়েছে। শুধু মাত্র কোরআনকে বিকৃত কোরতে পারেনি। আর মহামানবদের শিক্ষাকে, তাঁদের পথ থেকে মানুষকে ভুল পথে পরিচালিত করার ক্ষেত্রে সব সময়ই মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে ঐ সমস্ত বিকৃত দীনের মোল্লা, পুরোহিত, পণ্ডিত, রব্বাই, সাদ্দুসাই এক কথায় ধর্মব্যবসায়ীরা। কাজেই আজ হিন্দু, বৌদ্ধ, ইহুদি খ্রীস্টান সমস্ত জাতির প্রতি আমাদের আহ্বান হোল, "আসুন, আবার আমরা ভাই হই, এক জাতি হয়ে মানবতার কল্যাণে, বিশ্বশান্তির জন্য ঐক্যবদ্ধ হই।" আপনারা আত্মা দিয়ে একটা কথা উপলোব্ধি করুন যে, মূলত স্রষ্টাহীন দাজ্জালের তৈরি এই সভ্যতা, জীবন-ব্যবস্থা গ্রহণ করে আমরা আমাদের জাতীয় জীবনে প্রয়োগ করার ফলে অশান্তির মধ্যে নিপতিত হয়েছি। দাজ্জাল পৃথিবীময় যেই জীবন ব্যবস্থা কায়েম কোরে দিয়েছে আমরা সেটা মেনে নিয়েছি। মেনে নিয়ে আমাদের জাতীয় জীবন পরিচালিত কোরছি স্রষ্টার বিধানের বাইরের বিধান দিয়ে। এতে আমাদের শান্তি নেই। আর আমাদের ব্যক্তি জীবন দখল কোরে আছে কোন না কোন ধর্ম ব্যবসায়ী মোল্লা, পুরোহিত, আর পণ্ডিত শ্রেণী। ধর্ম ব্যবসায়ীরা আমাদের ব্যক্তি জীবন দখল কোরে ধর্ম ব্যবসা কোরে খাচ্ছে। আসুন- আমরা ভাই হই, আমরা এক জাতি হোয়ে যাই। আমাদের মধ্যে সমস্ত ভেদাভেদ মুছে দিই। আমরা এক আদম হাওয়ার সন্তান। আমরা ভাই। আমাদের শরীরের ভেতরের সবার রক্ত লাল। এই পৃথিবীর মাটি আমাদের জন্য। আমরা এই পৃথিবীর মাটি থেকে তৈরী হোয়েছি। এই পৃথিবীর সর্বত্র যাওয়ার অধিকার আমাদের রয়েছে, এটা আমাদের স্রষ্টাই আমাদেরকে দিয়েছেন। তেমনি পৃথিবীর সর্বত্র ফসল ফলানোর, ন্যায় সঙ্গত কথা বলার অধিকার আমার রয়েছে। কেউ আমাদের এই অবাধ স্বাধীনতাকে বাধা সৃষ্টি কোরতে পারে না। আমাদের একটা পরিচয় আমরা সকলে আল্লাহর বান্দা, বনী আদম। আমাদের জীবন-ব্যবস্থা হবে একটা। আল্লাহর দেওয়া জীবন-ব্যবস্থা। আমাদের অনুকরণীয়, অনুসরণীয়, আদর্শ ব্যক্তিত্ব আল্লাহর রসুল কারন তিনি শেষ প্রেরিত মহামানব। আসুন আমরা ভাই হয়ে যাই। আপনাদের মধ্যে যে সমস্ত নবী-রসুলরা এসেছেন তাঁরাও আল্লাহর নবী রসুল ছিলেন। কিন্তু দুঃখজনক আজ তাঁদের শিক্ষা ভুলিয়ে দেওয়া হোয়েছে। তাঁরাও মানবতার কল্যাণে এসেছেন এবং সম্পূর্ণরূপে নিঃস্বার্থভাবে কাজ কোরেছেন। কোন বিনিময় নেননি, কোন ব্যবসা করেননি ধর্ম নিয়ে। তাঁদের আগমনের শেষ পর্যায়ে এসেছেন মহানবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)। আসুন, আমরা সবাই ভাই হই, আসুন আমরা সবাই বন্ধু হই, আসুন আমরা সবাই একটা জীবন-ব্যবস্থা গ্রহণ করি। স্রষ্টার দেওয়া শেষ জীবন-ব্যবস্থা। জাতীয় কবির সঙ্গে আমরা কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে উচ্চারণ করি-

সত্যতে নাই ধানাই পানাই,
সত্য যাহা সহজ তাই,
সত্য যাহা সহজ তাই;
আপনি তাতে বিশ্বাস আসে,
আপনি তাতে শক্তি পাই,
সত্যতে জোর-জুলুম নাই।

আসুন সিস্টেমটা পাল্টাই

প্রকৃত এসলামে জুম'আর চিত্র

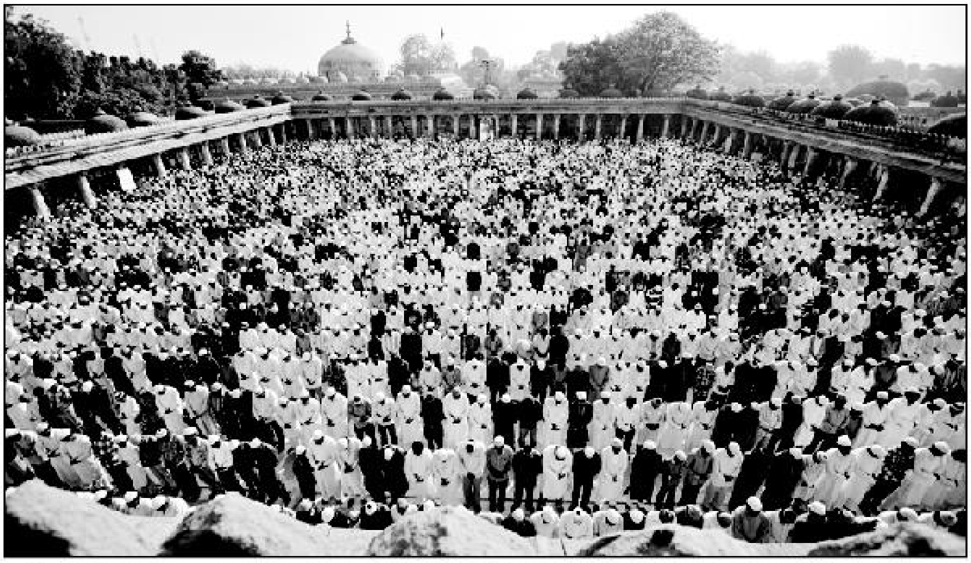

পৃথিবীর কোথাও আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত না থাকলেও মহাসমারোহের সাথেই কায়েম করা হয় জুম'আর সালাহ (নামাজ)

জুম'আ একটি রাষ্ট্রীয় এবাদত

জুম'আর সালাহ এসলামের একটি বিশেষ সালাহ, যা সপ্তাহে মাত্র একবার কায়েম কোরতে হয়। ব্যক্তিগতভাবে এই সালাহ কায়েম করা যায় না, সামষ্টিকভাবে জামায়াতে, মসজিদে গিয়ে কায়েম কোরতে হয়। প্রশ্ন হোল- অন্যান্য সালাতের সঙ্গে জুম'আর সালাতের এই পার্থক্য কেন, জুম'আর বিশেষত্ব কি?

আল্লাহর রসুল ১৪০০ বছর আগে এই জাতিটিকে যেভাবে রেখে গিয়েছিলেন সেটা এখন তার সেই অবস্থানে নেই। তিনি রেখে গিয়েছিলেন একটি ইস্পাতের মত কঠিন ঐক্যবদ্ধ, একজন নেতার (এমাম) অধীনে সুশৃঙ্খল ও আনুগত্যশীল একটি উম্মাহ, যে উম্মাহ ধীরে ধীরে নিজেদের মধ্যে মতবিরোধ কোরে, মারামারি কোরে আজ হাজার হাজার ভাগে বিভক্ত। তিনি রেখে গিয়েছিলেন এমন একটি জাতি যার প্রতিটি সদস্য ছিল দুর্ধর্ষ যোদ্ধা, আর আজকের এই জাতি যে এসলাম পালন কোরছে তা কেবল মৃত্যুভয়ে ভীত কাপুরুষ তৈরী করে। সেই প্রকৃত উম্মতে মোহাম্মদীও জুম'আ কায়েম কোরতেন, তাদের সমাজ আর আজকে আমাদের সমাজে আকাশ পাতাল ফারাক। সেই সমাজে সার্বভৌমত্ব ছিল আল্লাহর, আইন-কানুন, অর্থনীতি, দণ্ডবিধি সমস্তকিছু ছিল কোর'আন মোতাবেক আর আজকের আমাদের সমাজে সার্বভৌমত্ব মানুষের, দাজ্জালের। মানুষের তৈরী মতবাদ গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত, দণ্ডবিধি মানুষের তৈরী, অর্থনীতি সূদভিত্তিক। এভাবে সমগ্র জীবনব্যবস্থাটাই মানবরচিত। যেহেতু জুম'আর সালাহ সামষ্টিক তাই এর সঙ্গে সামষ্টিক জীবনব্যবস্থাও ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এই বিপরীত প্রেক্ষাপটে এসে ১৪০০ বছর আগের সেই জুম'আকে বুঝতে হোলে আমাদেরকে আনুষাঙ্গিক আরও কিছু বিষয়, কিছু ইতিহাস আলোচনা কোরতে হবে।

সালাতের মাধ্যমে জাতির মধ্যে যে ঐক্য, শৃঙ্খলা ও আনুগত্য সৃষ্টি করা দরকার তার প্রশিক্ষণ হবে পাশাপাশি তারা তাদের নেতার সংস্পর্শে আসবে ও কোন দিক নির্দেশনা থাকলে তা জানবে। একইভাবে আল্লাহর রসুলের তৈরী জাতির সকল সদস্য ও সদস্যা সপ্তাহে একবার জুম'আ মসজিদে একত্রিত হোতেন। সেখানে রসুলাল্লাহ, পরবর্তীতে খলিফা বা খলিফার প্রতিনিধিগণ এক কথায় জাতির এমাম তাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতেন। এই ভাষণই হোচ্ছে খোতবা।

এ ইতিহাস সর্বজনবিদিত যে, যতদিন রসুলাল্লাহ মক্কায় ছিলেন অর্থাৎ তাঁর হাতে রাষ্ট্রশক্তি ছিল না, ততদিন তিনি জুম'আর সালাহ কায়েম করেন নি কারণ জুম'আ একটি জাতীয়-রাষ্ট্রীয় এবাদত। মক্কায় তিনি ছিলেন ক্ষমতাহীন, জুম'আর যা কাজ অর্থাৎ শাসন, জাতিকে দিক নির্দেশনা দেওয়া, দণ্ডবিধি প্রয়োগ ইত্যাদি করার ক্ষমতা তখন তাঁর ছিল না। মদীনাতে আল্লাহর সার্বভৌমত্বভিত্তিক রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েম করার পরে তিনি আল্লাহর বিধান দিয়ে জাতিকে পরিচালনা করার অধিকার লাভ কোরলেন, তখনই তিনি জুম'আ কায়েম

আরম্ভ কোরলেন।

একটি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ রাখার জন্য সর্বপ্রথম যে জিনিসটি প্রয়োজন তা হোল জাতির একজন নেতা থাকতে হয় যিনি আল্লাহর প্রতিটি হুকুম বাস্তবায়নে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, অনড়। সেই নেতার আদেশ জাতিকে বিনা প্রশ্নে, বিনা দ্বিধায় পালন কোরতে হয়। মোসলেম উম্মাহর রাষ্ট্রীয় কার্যালয় হোল মসজিদ। রসুলাল্লাহ ও প্রকৃত এসলাম যতদিন ছিল ততদিন মসজিদ থেকেই জাতির সকল কর্মকাণ্ড পরিচালিত হোত। সালাহ কায়েম ছাড়াও মসজিদ থেকে প্রেরিত হোত সেনাবাহিনী, মসজিদেই খলিফার সাক্ষাৎ কোরতেন বিভিন্ন রাষ্ট্রের দূতগণ। মসজিদ ছিল প্রাণবন্ত, জীবন্ত। প্রতি ওয়াক্তে নারী ও পুরুষ প্রায় সকলেই সালাতে অংশ নিত। তাই মসজিদ ছিল সবচেয়ে ব্যস্ততম এবং জাতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ স্থান। মসজিদকে আল্লাহর ঘর বলার কারণও এটাই। এমাম কেন্দ্রিক তথা মসজিদ কেন্দ্রিক এই জাতির একজন পুরুষ বা নারীও এই নেতৃত্বের, শৃঙ্খলার বাইরে ছিল না। যে এই ব্যবস্থার বাইরে থাকবে সে এসলাম থেকেই বহির্গত হোয়ে যাবে, অর্থাৎ উম্মাহর অন্তর্ভূক্ত থাকবে না [আল হারিস আল আশয়ারী (রা:) থেকে আহমদ, তিরমিযি, বাব উল এমারত, মেশকাত]।

এইভাবে কেন্দ্রীভূত থাকার জন্য আল্লাহ দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাহর বন্দোবস্ত দিয়েছেন। এই সালাতের মাধ্যমে জাতির মধ্যে যে ঐক্য, শৃঙ্খলা ও আনুগত্য সৃষ্টি করা দরকার তার প্রশিক্ষণ হবে পাশাপাশি তারা তাদের নেতার সংস্পর্শে আসবে ও কোন দিক নির্দেশনা থাকলে তা জানবে। একইভাবে আল্লাহর রসুলের তৈরী জাতির সকল সদস্য ও সদস্যা সপ্তাহে একবার জুম'আ মসজিদে একত্রিত হোতেন। সেখানে রসুলাল্লাহ, পরবর্তীতে খলিফা বা খলিফার প্রতিনিধিগণ এক কথা জাতির এমাম তাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতেন। এই ভাষণই হোচ্ছে খোতবা। এর মাধ্যমে তাঁরা জাতিকে দিক নির্দেশনা দিতেন, পরবর্তী কর্মসূচি, কাজের নীতিমালা ইত্যাদি ঘোষণা কোরতেন। জুম'আর সালাতের পরে আল্লাহর নাজেলকৃত বিধান মোতাবেক অপরাধীদের দণ্ড কার্য্যকর করা হোত এবং খেয়াল রাখা হোত যেন জুম'আর দিনেই ঐ সপ্তাহের যাবতীয় বিচারকার্য্য সমাপ্ত হোয়ে যায়, পরবর্তী সপ্তাহ পর্যন্ত যেন দীর্ঘায়িত না হয়। এসকল ব্যস্ততার কারণে আল্লাহ জুম'আর সালাহ মাত্র দুই রাকাত কোরে দিয়েছেন। জুম'আর দিনে এতসব গুরুত্বপূর্ণ কাজ করা হোত বোলেই জুম'আর সালাতের এতই গুরুত্ব, এজন্যই আল্লাহ জুম'আয় যাওয়ার জন্য আলাদাভাবে হুকুম কোরেছেন (জুম'আ ৯), রসুলাল্লাহও জুম'আয় অনুপস্থিত থাকলে তার বিষয়ে কঠিন সতর্কবাণী উচ্চারণ কোরেছেন এবং খোতবা শোনাকে ওয়াজিব কোরেছেন। যতদিন এসলামের শাসন অর্ধ পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত ছিল ততদিন প্রতিটি এলাকার প্রশাসকরা খলিফার নির্দেশ ও নীতিসমূহ খলিফার পক্ষ থেকে তাদের স্ব-স্ব মসজিদে জুমার খোতবার মাধ্যমে বোলে দিতেন। অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধি ছাড়া জুম'আর অস্তিত্ব কল্পনাও করা যেত না। খোতবার প্রধান দিক হোল জাতির উদ্দেশ্যে দিক নির্দেশনা। রাষ্ট্রের পক্ষে যিনি এই ভাষণ দিবেন তিনিই খতিব। বর্তমানে আটলান্টিকের তীর থেকে ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত অর্ধ পৃথিবী জুড়ে শত শত ভাগে খণ্ড-বিখণ্ড মোসলমান নামক এই যে বিশৃঙ্খল জনসংখ্যা পড়ে আছে তা যেন মরা প্রাণহীন। এজন্য এদের মসজিদগুলিও মরা, প্রাণহীন। এরা এখন দাজ্জালের পদানত ভৃত্য। একইভাবে খতিবও এখন আর জুম'আর দিনে রাষ্ট্রের প্রতিনিধি হিসাবে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণদানকারী নন, তিনি কেবল নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময়ে জুম'আর নামাজ পড়ান। তার দ্বারা বিচার ফায়সালা তো দূরের কথা, তিনি মসজিদ কমিটির চোখ রাঙানীর ভয়ে থাকেন সদা-তটস্থ। কি করুণ পরিণতি!

আজ এই জাতির জাতীয় ও সামষ্টিক কাজের সঙ্গেই মসজিদের কোন যোগসূত্র নেই, জুম'আরও কোন যোগসূত্র নেই। রসুলাল্লাহর জারি কোরে যাওয়া জুম'আর মতই আজও মসজিদে শুক্রবারে খোতবা দেওয়া হয়, কিন্তু সেই খোতবা দেওয়া হয় বই দেখে। সেই খোতবাতে জাতির নেতার কোন বক্তব্য থাকে না কারণ জাতির তো কোন নেতাই নেই। জুম'আর প্রকৃত আকীদা, উদ্দেশ্য ভুলে যাওয়ার দরুণ আজকে অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, জুম'আ মসজিদে চোরের বিচার হওয়া দূরে থাক চুরি যাওয়ার ভয়ে সাধারণত কেউ দামি জুতা পরে মসজিদে যান না।

দুটি শিক্ষ্যণীয় গল্প

পাথর ও স্বর্ণ

এক লোক সারাক্ষণ শুধু অভিযোগ করে। তার ধারণা, কেউ তার যোগ্যতার যথাযথ মূল্যায়ন করে না। একদিন একজন জ্ঞানী লোক বিষয়টি সম্পর্কে জানলেন এবং লোকটির কাছে আসলেন। তিনি মাটি থেকে একটি পাথর তুলে একটি পাথরের স্তুপে ফেলে দিলেন। তারপর তিনি সে-লোককে বললেন: 'পাথরের স্তুপ থেকে আমার ফেলে-দেওয়া পাথরটি খুঁজে বের কর।' লোকটি পাথর খুঁজে বের করার জন্য অনেক চেষ্টা করল, কিন্তু হাজার হাজার পাথর থেকে ওই নির্দিষ্ট পাথরটি আলাদা করতে পারল না। এরপর জ্ঞানী লোকটি এক টুকরা স্বর্ণ পাথরের স্তুপে ফেলে দিলেন। তিনি বললেন: 'এবার স্বর্ণের টুকরাটি খুঁজে বের কর।' লোকটি অনায়াসে স্বর্ণের টুকরাটি পাথরগুলো থেকে আলাদা করে ফেলল।

এবার জ্ঞানী লোকটি বললেন, "দেখ, তুমি যখন স্বর্ণের মতো মূল্যবান হবে, তখন লোকে তোমাকে সহজেই চিনে নেবে এবং তোমার মূল্যায়ন করবে। কিন্তু 'পাথর' হয়ে তুমি কখনোই স্বর্ণের মতো গুরুত্ব পাবে না। যদি তুমি অন্যের কাছে মূল্য পেতে চাও, অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাও, তবে নিজেকে সেভাবে গড়ে তোলো। অযথা অভিযোগ করে কোনো লাভ নেই।'

জুতা হারানো

দ্রুত গতিতে ধাবমান একটি রেলগাড়ির দরজার কাছে বসে ছিলেন এক বৃদ্ধ। নিজের অজান্তেই তার একপাটি জুতো গাড়ির বাইরে পড়ে গেল। অন্য যাত্রীরা তার জন্য দু:খ প্রকাশ করলেন। কিন্তু সবাইকে অবাক করে দিয়ে ওই বৃদ্ধ লোক তার আরেকপাটি জুতোও বাইরে নিক্ষেপ করলেন। যাত্রীদের একজন জিজ্ঞেস করলেন: 'আপনি কেন জুতোটি ফেলে দিলেন। জুতোটিতো দেখতে নতুন।' বৃদ্ধ লোক উত্তর দিলেন: 'তুমি ঠিক বলছ। আজকেই কেবল আমি জুতোজোড়া কিনেছি। কিন্তু এর একপাটি যখন বাইরে পড়েই গেছে, তখন আর বাকি পাটি রেখে লাভ কী। একপাটি জুতো আমি ব্যবহার করতে পারবো না। অন্যদিকে বাইরে যে-পাটিটি পড়ে গেছে সেটি কেউ পেলে, সেও ব্যবহার করতে পারবে না। তাই আমি জুতোর দ্বিতীয় পাটিটিও বাইরে ফেলে দিয়েছি। যদি কেউ জুতোজোড়া খুঁজে পায়, তবে তার উপকার হবে।'

সংগ্রহ: চায়না রেডিও

DIVIDE & RULE-1

দাজ্জালের বিভক্তিকরণ নীতি:

শোষণের হাতিয়ার

মোহাম্মদ রিয়াদুল হাসান

মানবজাতিকে রাজনৈতিকভাবে, রাষ্ট্রগতভাবে, শরিয়াহগতভাবে, এবং এমনকি আত্মিকভাবে বিচ্ছিন্ন ও বিভক্ত করার জন্য বর্তমান দাজ্জালীয় সভ্যতার রূপকাররা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার আড়ালে যে কয়টি হিংসাত্মক নীতি পৃথিবীতে কায়েম কোরেছে তার অন্যতম হলো Divide and Rule নীতি অর্থাৎ মানবজাতিকে ঐক্যহীন কোরে ফেলা, তারপর শাসন করা। পক্ষান্তরে আকীদাগত ভাবে (Conceptually) শেষ নবীর উপর দায়িত্ব হলো সমস্ত মানবজাতিকে একটি জীবনব্যবস্থার অধীনে এনে এক জাতিতে পরিণত করা। তাদের আলাদা আলাদা কোন সত্তা থাকবে না, সবাই মিলে একটা জাতি হবে। অর্থাৎ সোজা কথা বনী আদম। সাদা, কালো, তামাটে, লম্বা, খাটো, উত্তরের, দক্ষিণের, পূর্বের, পশ্চিমের, পাহাড়ি, বনাঞ্চলের, সমতলভূমির, বরফ অঞ্চলের, মরুঅঞ্চলের সমস্ত মানবজাতি হবে একটা জাতি। তাদের সকলের পিতা একজন আদম (আ:) (Adam)। সেই সূত্রে তারা সকলে ভাই ভাই। এই দীনের নাম আল্লাহ রাখলেন দীনুল হক। দীনুল হক বলার কারণ হোচ্ছে এটা আল্লাহ থেকে আগত, আর আল্লাহ হলেন সমস্ত ন্যায়, হক, সত্যের উৎস। পক্ষান্তরে এবলিস থেকে আগত সবকিছুই হলো মিথ্যা, প্রতারণা, অন্যায়, অশান্তি।

এসলামের বিরুদ্ধবাদীরা প্রশ্ন তুলতে পারেন, এটা কিভাবে সম্ভব? ১৪০০ বছর আগে একটি আরবীয় গোত্রে জন্ম নেয়া আরবী ভাষাভাষী নবীর উপরে যে দীন, জীবনব্যবস্থা অবতীর্ণ হোয়েছে সেটা সমস্ত দুনিয়াতে কার্যকরী হবে কিভাবে? এটার সহজ জবাব হলো, এই দীনের আরেক নাম দীনুল ফেতরাত বা প্রাকৃতিক দীন। প্রাকৃতিক নিয়ম নীতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আল্লাহ এ দীনটি তৈরী কোরেছেন। আল্লাহ যেমন আগুন, পানি, মাটি, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন তৈরী কোরেছেন, যেগুলো পৃথিবীর যেকোন প্রান্তের মানুষের উপযোগী, সকলের জন্য অপরিহার্য্য। এই সব প্রাকৃতিক নিয়ামক যেমন সমস্ত দুনিয়াতে কার্যকরী, প্রয়োগযোগ্য, গ্রহণযোগ্য তেমনি এ জীবনব্যবস্থাটাও সমস্ত দুনিয়াতে গ্রহণযোগ্য, প্রয়োগযোগ্য, কার্যকরী। এক কথায় সমস্ত দুনিয়াতে শান্তি দিবে এ জীবনব্যবস্থা। পৃথিবীর যেখানে, যে প্রান্তেই এটাকে কায়েম করা হোক, কার্যকরী করা হোক, প্রয়োগ করা হোক না কেন তারা সমানভাবে একই রকম শান্তি পাবে। তাহোলে এসলামের প্রাথমিক ধারণাই হোল-- সমস্ত মানবজাতিকে একটা জাতিতে পরিণত করে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা (To sustain peace by uniting mankind). অশান্তির মূল কারণ এই বিভাজন, সুতরাং সকল প্রকারের বিভাজন বিভক্তিকে মিটিয়ে দিয়ে একটা জাতিতে পরিণত করবে আল্লাহর দেওয়া এই জীবনব্যবস্থা।

অপরপক্ষে দাজ্জাল বা বর্তমানের ইহুদী-খ্রিস্টান বস্তুবাদী 'সভ্যতা', আল্লাহর উলুহিয়াতকে, সার্বভৌমত্বকে, রবুবিয়াতকে, মুলকিয়াতকে অস্বীকার কোরেছে, নিজেকে রব, এলাহ, সমস্ত দুনিয়ার অধিকর্তা দাবী কোরছে। দাজ্জালের তৈরী জীবন-ব্যবস্থা, আইনকানুন, দণ্ডবিধি, অর্থনীতি, সমাজব্যবস্থা, শিক্ষানীতি, সংস্কৃতি সমস্ত কিছু আজ দুনিয়াময় কার্যকরী কোরেছে, যেগুলি এসলামের বিপরীত। দাজ্জালের নীতি হলো সমস্ত দুনিয়াকে ভাগ করে ঐক্যহীন করে দুর্বল কোরে ফেলা, তারপর একটা একটা কোরে শাসন করা অর্থাৎ Divide and rule. তাদের শাসনেরই অপর নাম শোষণ। তাহোলে এসলামের নীতি হলো Unite and Secure Peace আর দাজ্জালের নীতি হলো Divide and rule. দু'টি সভ্যতার মূলনীতিই একেবারে বিপরীত, তাই চরিত্রও স্বভাবতই বিপরীতমুখী, কাজেই ফলাফলও হবে বিপরীত, এটা সাধারণ জ্ঞান। তাহোলে মানবজাতির আদিম প্রশ্ন: শান্তি কিভাবে আসবে?

এর উত্তর হোল: দীনুল হকেই শান্তি অনিবার্য্য। আসতেই হবে কারণ এসলাম সব বিভেদ, বিভাজন ভুলে মানব জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে। আর ঐক্যতেই শান্তি এটা প্রাকৃতিক নিয়ম। দশজন ঐক্যবদ্ধ লোক একশত জন্য ঐক্যহীন লোকের বিরুদ্ধে বিজয়ী হবে। United we stand, divided we fall. কাজেই প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে শান্তি আসতেই হবে। আর দাজ্জালের ব্যবস্থাতে মানুষের ঐক্যকে ভেঙ্গে ভেঙ্গে টুকরা টুকরা করা হোচ্ছে। কাজেই এ বিভাজনের যাবতীয় নীতি ও ব্যবস্থা বজায় রেখে যতই শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হোক, অশান্তি অনিবার্য্য। এভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠার সকল চেষ্টাই প্রকৃতপক্ষে লোক দেখানো চেষ্টা (Window dressing)। মানুষ যেন দাজ্জাল অর্থাৎ ইহুদী খ্রিস্টান 'সভ্যতা'র শাসনব্যবস্থার অধীনেই থাকে সেজন্য শান্তি রক্ষার এই আপ্রাণ চেষ্টা দেখানো হোচ্ছে। কিন্তু কোনভাবেই শান্তি আসে নি, আসবে না, কারণ বিষবৃক্ষে সুমিষ্ট ফল আশা করা অর্থহীন। যে গাছের বীজ বপন করা হবে সেই গাছই জন্মাবে এবং ফলও তাই হবে। মাকাল ফলের বীজ থেকে তিক্ত মাকাল ফলই হবে, সুমিষ্ট আম হবে না।

Divide and Rule নীতি কেন অশান্তির বীজ তার একটু ব্যাখ্যা দেওয়া যাক। আমরা এখানে সংক্ষেপে কয়েকটি বিষয়ের প্রতি আলোকপাত কোরব।

সকল আদম সন্তান একে অপরের ভাই বোন। তাদের মধ্যে অলঙ্ঘনীয় ব্যবধান সৃষ্টি কোরেছে হৃদয়বিদারী কাঁটাতার যা অতিক্রম কোরতে গেলেই বুলেটে ঝাঁঝরা হোয়ে যেতে হয়।

স্বাধীনতা নামক মরিচিকা

ইহুদি-খ্রিস্টানরা প্রথমে কয়েক-শ' বছর ধোরে সমস্ত দুনিয়াকে শাসন ও শোষণ কোরল। পৃথিবীর এক সময়ের সমৃদ্ধ অঞ্চলগুলি থেকে অন্যায়ভাবে সম্পদ লুণ্ঠন কোরে এক জায়গায় জড়ো কোরল, ফলে কয়েক বছর পরে ভয়াবহ অর্থনৈতিক বৈষম্যের সৃষ্টি হোল। পুঁজিবাদী সুদভিত্তিক এমন অর্থব্যবস্থা কায়েম কোরল যার অনিবার্য্য পরিণতিতে গুটি কয়েক লোকের হাতে অগাধ সম্পদের পাহাড় জমে উঠলো আর সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষিজীবি, শ্রমজীবি সাধারণ মানুষ ভয়াবহ দারিদ্র্যের দিকে নিক্ষিপ্ত হোল, ফলে অসন্তোষ, বিক্ষোভ, অশান্তি দানা বাঁধতে শুরু কোরল। কেউ কেউ বোলতে পারেন মানুষই তো ভাগ হোতে চাইছে। হ্যাঁ, এ কথা সত্য যে মানুষই ভাগ হোতে চাইছে কিন্তু এ কথা অস্বীকার করা যাবে না, যে মানুষ যখন শোষণ, বঞ্চনা, অবিচারের শিকার হোয়েছে তখনই আলাদা হওয়ার প্রবণতা দেখা দিয়েছে; পরিণতিতে যুদ্ধ, দাঙ্গা অবশেষে পৃথক ভৌগোলিক রাষ্ট্র গঠন করা হোয়েছে। একটি উদাহরণ দেওয়া যায়। একই পিতার দশ পুত্র। পিতার সমুদয় সম্পত্তির উপর প্রত্যেকেরই সমান অধিকার রোয়েছে। এখন একজন যদি অধিকাংশ ধন সম্পত্তি দখল কোরে অন্যদের বঞ্চিত করে তখন এক পর্যায়ে অন্য সন্তানেরা একই পরিবারে থাকতে চাইবে না, তারা পিতার সম্পত্তি ভাগ কোরে প্রত্যেকে আলাদা হোয়ে যেতে চাইবে। এটাকেই তারা স্বাধীনতা বোলে মনে কোরবে। কিন্তু এতে যে তারা দুর্বল হোয়ে গেল, একই বাড়িতে কয়েকটি কর্তৃপক্ষ সৃষ্টি হোল, শুরু হোল প্রতিযোগিতা, কোন্দল, হিংসা, বিষোদগার, অন্যের ভাগের প্রতি লালসার দৃষ্টিপাত ইত্যাদি। তারপর কিছুদিনের মধ্যেই আরম্ভ হবে ভ্রাতৃঘাতী সংঘাত।

ঠিক এভাবেই দাজ্জাল দুনিয়ার মানবজাতিকে প্রাথমিকভাবে বিভক্ত (Primary Division) করল, স্বাধীনতার (Independence) নামে অসংখ্য ভৌগোলিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে, প্রতিটি জাতির সামনে ভৌগোলিক স্বাধীনতাকে মুক্তির প্রথম নিয়ামক বা উপাদান হিসাবে চিত্রিত করা হোল। মানুষ কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়মের বাইরে চোলতে পারে না, বেঁচে থাকার জন্য তাকে প্রকৃতির কাছে যেতেই হয়; অর্থাৎ আল্লাহর কাছে যেতেই হোচ্ছে। আল্লাহ বলেন, সবকিছুই আল্লাহর থেকে সৃষ্ট এবং আল্লাহর কাছেই ফিরে আসবে। যারা আল্লাহর নাম মুখে নিতে দ্বিধা করেন তারা বলেন, প্রকৃতির কাছে ফিরে আসতে হবে। যারা স্বাধীনতার মতবাদের বোদ্ধাজন তাদের প্রতি আমার প্রশ্ন, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র, এ্যাস্টরয়েড বেল্টের গ্রহাণু, প্রস্তর, ধূলিকণা (Galactic Body) যতকিছু আছে, এগুলি স্রষ্টার বেঁধে দেয়া অলংঘনীয় যে নিয়মে বাঁধা, যা তার অস্তিত্বের জন্য অপরিহার্য্য, তারা যদি বলে, 'আমরা আজ থেকে কোন বাধা-নিষেধ, নিয়ম মানব না, আমরা স্বাধীন হোয়ে যাব, তাহোলে প্রকৃতিতে কি হবে? এমন বিপর্যয় হবে যে একমুহূর্তের মধ্যে এ দুনিয়া ধ্বংসস্তুপে পরিণত হবে। সুতরাং ইচ্ছা কোরলেও আপনি আপনার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য পুরোপুরি স্বাধীন থাকতে পারবেন না। এটা সম্ভব না, এ দাবি করাটাও অপরিণামদর্শী, ভুল। প্রাকৃতিক নিয়মের মধ্যে আপনাকে থাকতেই হবে। এই নিয়মকে উপেক্ষা করে দাজ্জাল আবিষ্কার করলো ভৌগোলিক স্বাধীনতার মতবাদ। পৃথিবীর উপরিভাগ যত টুকরো হবে, সেখানকার জনসংখ্যা ততো শক্তিহীন হবে, তাকে শাসন ও শোষণ করা হবে ততো সহজ। সে কিছু কাল্পনিক

সীমারেখা টেনে এই ভাগ করল।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এমনভাবে নদ-নদী, খালবিল, পর্বতমালা সৃষ্টি ও স্থাপন করে রেখেছেন যেন কোনভাবেই একটা থেকে আরেকটাকে আলাদা করা না যায়, কোরলেই ভারসাম্য নষ্ট হয়। একটার সাথে আরেকটা সম্পর্কিত (Interrelated) একটা ছাড়া আরেকটা অর্থহীন। পাহাড় ছাড়া নদী হয় না, নদী ছাড়া খালবিল হয় না, নদী থাকলে সমুদ্রও থাকতে হবে এভাবে সবকিছু নিয়েই প্রকৃতি। পর্বতমালাগুলির উৎপত্তি, বিস্তৃতি এক জায়গায় সর্বোচ্চ চূড়া আরেক জায়গায়। পর্বতমালা না থাকলে যেমন বৃষ্টি বর্ষণ হবে না, বৃষ্টি বর্ষণ না হোলে যেমন সবুজ গাছপালা জন্মাবে না, নদীতে পানি প্রবাহিত না হোলে সমতলভূমি শস্য শ্যামলা হবে না, জনবসতি গড়ে উঠবে না তেমনি জনবসতি না থাকলে জলাধারগুলিও কোন কাজে আসবে না। আল্লাহ এমনভাবেই সৃষ্টি কোরেছেন সমস্ত দুনিয়াটাকে যেন কোনভাবেই ভাগ করা না যায়। কিন্তু দাজ্জাল দুনিয়াটা ভাগ কোরেছে, এর ভারসাম্য ধ্বংস কোরেছে। এখন ভাগটা কিভাবে করা হবে, সূত্র দিয়েছে বিভিন্ন ভাবে যেমন বর্ণের ভিত্তিতে, ভাষার ভিত্তিতে, সংস্কৃতির ভিত্তিতে, ধর্মের ভিত্তিতে। বোলেছে তোমরা ভাগ (স্বাধীন) হও, শান্তিতে থাকবে, তোমাদের অধিকার তোমরা ফিরে পাবে। কিন্তু প্রশ্ন হোল এই অধিকার কে দেবে? কার কাছ থেকে মানুষ বুঝে নেবে অধিকার? পৃথিবীর স্রষ্টা আল্লাহই মানুষের মৌলিক অধিকার সরবরাহ করেন। তাই তিনি রব (পালনকারী), রাজ্জাক (অন্নদাতা, জীবিকা দানকারী) নাম ধারণ কোরেছেন। পৃথিবীকে কর্ষণ কোরে খাদ্য উৎপাদন করার অধিকার তিনি মানুষকে দিয়েছেন, যারা এই অখণ্ড পৃথিবীকে খণ্ড খণ্ড কোরে মানুষকে চাষাবাদ করার অধিকার থেকে বঞ্চিত করে, তারাই মানুষের মৌলিক অধিকার লুণ্ঠন করে। আজ এভাবে ভাগ করতে করতে পুরো পৃথিবীকে তারা প্রায় দুইশত ভাগ কোরেছে। শুধু এক আরবকে ভেঙ্গেই করা হোয়েছে ২২ ভাগ। ভারত উপমহাদেশকে ভেঙ্গে ৬ ভাগ কোরেছে। এশিয়াকে ৪৯ ভাগ কোরেছে, ইউরোপকে ৪৭ ভাগ করছে, আফ্রিকাকে ৫৭ ভাগ কোরেছে, উত্তর আমেরিকাকে ৩ ভাগ, দক্ষিণ আমেরিকাকে ১৩ ভাগ কোরেছে। শোনা যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রও আর যুক্ত থাকতে পারছে না, সেখানেও ভাগ হওয়ার আওয়াজ উঠছে। কিছুদিন আগে সুদানকে দুই ভাগ করা হোল, আফগানিস্তানকে নাকি কয়েকভাগ করার পরিকল্পনা চূড়ান্ত। ইরাককে ভাগ করার পরিকল্পনা করা হোচ্ছে, ভারতের কাশমীর ও আসামের স্বাধীনতা সংগ্রাম চোলছে কয়েক দশক ধোরে। এভাবে চলেছে বিভক্তিকরণ প্রক্রিয়া। একই দেশ কোরিয়াকে ভেঙ্গে কোরেছে উত্তর কোরিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া। এমন আরও আছে। এখন ভাগ করতে করতে ভৌগোলিক সীমারেখা এমনভাবে ভাগ কোরেছে যে, প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হোয়ে গেছে, অবিচার সৃষ্টি হোয়ে গেছে, যার প্রভাব পড়েছে দুনিয়ার প্রত্যেকের এলাকায়। যেমন একটা নদীর উৎস পড়েছে এক দেশে, মোহনা পড়েছে আরেক দেশে। একদেশ তার সীমানায় নদীতে বাঁধ নির্মাণ কোরে অন্য প্রতিবেশী দেশকে পানিশূণ্য কোরে ফেলছে, নাব্যতা ধ্বংস কোরছে, আবার যখন ইচ্ছা প্লাবিত কোরছে। জমি ও পানির ভাগাভাগি নিয়ে বহু সীমানায় সংঘাত চিরস্থায়ী রূপ নিয়েছে। এখন দুনিয়ার কর্তৃপক্ষ 'দাজ্জাল' অর্থাৎ ইহুদী খ্রীস্টান বস্তুবাদী 'সভ্যতা' অর্থাৎ পাশ্চাত্য প্রভুরা যদি দুনিয়াবাসীকে বলে, 'হে দুনিয়াবাসী! তোমাদেরকে একমাস সময় দেয়া হলো, তোমরা ভাগ হও। সেনাবাহিনী, সরকার তোমাদেরকে কিছুই বলবে না, যত পার স্বাধীনতার পতাকা উড়াও।' তাহোলে আমার মনে হয় পৃথিবী কমপক্ষে লক্ষ ভাগ হোয়ে যাবে। প্রতিটি জেলা স্বাধীন হোয়ে যাবে; সেই প্রবণতা পৃথিবীতে ইতিমধ্যে সৃষ্টি হোয়েছে। কিন্তু অত্যন্ত সরল সূত্র হোচ্ছে- ঐক্যবদ্ধ না হোয়ে, সুশৃঙ্খল না হোয়ে এবং একজন নেতার নেতৃত্ব বিনা পৃথিবীতে কোন জাতিই শ্রেষ্ঠত্ব লাভ কোরতে পারে নি। এটা চিরন্তন, শাশ্বত প্রাকৃতিক নিয়ম। আজকের বিশ্বের একক পরাশক্তি যুক্তরাষ্ট্র যা ৫২টি অঙ্গরাজ্য নিয়ে গঠিত। যদি ঐক্য ভেঙ্গে প্রতিটি রাজ্য স্বাধীনতা ঘোষণা করে তবে একদিনের মধ্যেই যুক্তরাষ্ট্র নামক পরাশক্তির পতন হবে।

রাষ্ট্রীয় প্রেক্ষাপটে আর্থ-সামাজিক বৈষম্য

আর্থিক ও সামাজিকভাবেও ইহুদী খ্রীস্টান 'সভ্যতা' দুনিয়াটাতে বৈষম্যের স্তর সৃষ্টি করল। ফার্স্ট ওর্য়াল্ড, সেকেন্ড ওর্য়াল্ড, থার্ড ওর্য়াল্ড, উন্নত বিশ্ব (Developed country), অনুন্নত বিশ্ব (Undeveloped country), উন্নয়নশীল বিশ্ব (Developing countgry) ইত্যাদি নাম দিয়ে বহুপ্রকার ভাগ করল। যারা অনুন্নত বিশ্বের দেশ তাদের নাকের সামনে উন্নয়নের মুলো ঝুলিয়ে দেওয়া হয় মোটা অঙ্কের ঋণ বা অনুদান। ঋণের অধিকাংশ অর্থ গলধকরণ কোরতে থাকে রাষ্ট্রের ক্ষমতায় আসীন নৈতিক চরিত্রহীন কিছু মানুষ, সেই ঋণ সুদে চক্রবৃদ্ধি হারে বেড়ে একসময় আর পরিশোধের পর্যায়ে থাকে না। ঋণের অর্থ এই অনুনন্নত বিশ্বের দেশগুলির ভিক্ষা গ্রহণের প্রবণতাই বৃদ্ধি করে এবং আজীবন ভিক্ষুকের দেশ বানিয়ে রাখে এবং নতজানু ভিক্ষুকদের সহজে শাসন করে।

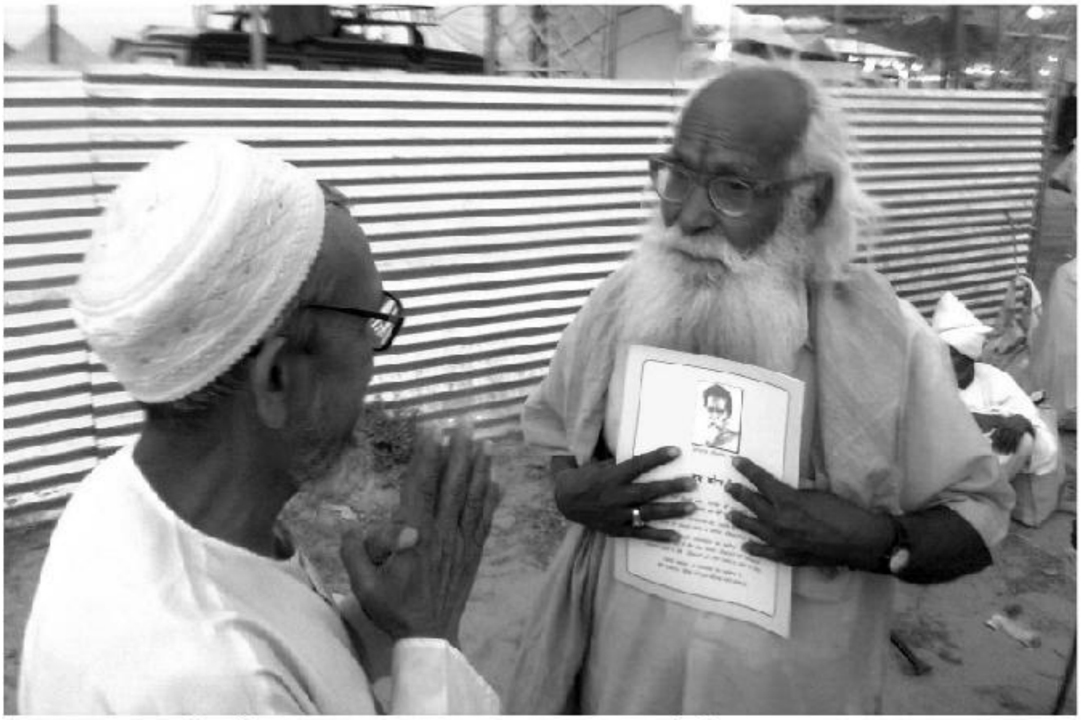

আগের দিনে হিন্দু ও মোসলেমদের মধ্যে এমন বন্ধুভাবাপন্ন সম্পর্কই বিরাজ কোরত, তারা পরস্পরকে সম্মান কোরতো কিন্তু বর্তমানে প্রায়ই তাদের একে অপরের বিরুদ্ধে শত্রুভাবাপন্ন মনোভাবের দৃষ্টান্ত দেখা যায়, দাঙ্গাও হয় অহরহ। এই বিভেদটা সৃষ্টি কোরেছে ইহুদি-খ্রিস্টান 'সভ্যতা' বা দাজ্জাল।

ধর্মীয় ভাগ

এরপর করল ধর্মীয় ভাগ। অনেকে বলতে পারেন ধর্মীয় বিভক্তি তো আগে থেকেই ছিল। এটা সত্য যে এটা আগে থেকে ছিল, কিন্তু ইহুদী খ্রীস্টান 'সভ্যতা' একে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছে। মাত্র কিছুদিন আগে (প্রেস কাউন্সিল অব ইন্ডিয়ার সভাপতি ও সাবেক বিচারপতি মার্কেন্ডি কাতজু বোললেন, ১৮৫৭ পর্যন্ত ভারতে সাম্প্রদায়িকতা বোলতে গেলে ছিলই না। হিন্দু ও মুসলিমের মধ্যে পার্থক্য ছিল বটে, কিন্তু শত্রুতার সম্পর্ক ছিল না। সিপাহী বিদ্রোহের সময়ও হিন্দু ও মুসলিম একতাবদ্ধভাবে ব্রিটিশ শাসকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কোরেছে। বিদ্রোহ দমনের পরে ব্রিটিশ সরকার ভারতীয়দেরকে Divide and Rule অর্থাৎ ঐক্যহীন কোরে শাসন করার নীতি গ্রহণ করেন।" ভারতীয় উপমহাদেশে হিন্দু মুসলমান সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা যে ব্রিটিশদের সৃষ্টি তার ভুরি ভুরি প্রমাণ দেওয়া যাবে। ইতিহাসে ফকীর আন্দোলন ও সন্নাসী বিদ্রোহ বোলে যে ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামের কথা জানা যায়, সেটা আসলে একই বিদ্রোহের দু'টি নাম। এতদ অঞ্চলের হিন্দু এবং মুসলিম শাসক ও জমিদারদের পৃষ্ঠপোষকতায় ও উভয় সম্প্রদায়ের প্রাণান্ত প্রচেষ্টায় ব্রিটিশ শাসকের ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছিল, যে বিদ্রোহই পরবর্তীতে সিপাহী বিদ্রোহে রূপ নেয়। এ সময়ের কথা পাঠককে স্মরণ কোরিয়ে দিতে কাজী নজরুলের একটি লাইন উদ্ধৃতি কোরছি।

হিন্দু না ওরা মুসলিম ঐ জিজ্ঞাসে কোন জন?
কাণ্ডারি বলো, 'ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মা'র'।

অর্থাৎ ভেদাভেদ তৈরীর যে প্রচেষ্টা ব্রিটিশ সরকার নিয়েছিল তার বিরুদ্ধে এই কথাগুলি ছিল কবির সাহসী উচ্চারণ। তারা এই উপমহাদেশকে আপাতঃ স্বাধীন কোরে চোলে গেলেও যাওয়ার আগে ধর্মের ভিত্তিতে পাক-ভারতকে ভেঙ্গে ভাগ ভাগ কোরে রেখে যায় যে ভাগগুলি বিগত বছরগুলিতে নিজেদের মধ্যে বহু যুদ্ধ কোরেছে এবং আজও একে অপরের বিরুদ্ধে শত্রুভাবাপন্ন, রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে লিপ্ত। এমনকি নিজেদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতার দাবিতেও সংগ্রামে লিপ্ত রোয়েছে বহু মানুষ। এভাবে অশান্তি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ কোরেছে।

(চোলবে...)

যোগাযোগ: হেযবুত তওহীদ, ০১৬৭০১৭৪৬৪৩,
০১৭১১০০৫০২৫, ০১৯৩৩৭৬৭৭২৫,
০১৮৫৩৯৯৩২২২, ০১১৯১৩৬৭১১০

বিশেষ কলাম ❑ আমিনুল এসলাম

যে প্রশ্নের উত্তর জানতেই হবে

এই পৃথিবী অপরূপ সুন্দর। পৃথিবীর আকাশ, বাতাস, নদী, নালা, পাহাড় সমস্ত কিছুকে মহান আল্লাহ নিজ পরিকল্পনায় সাজিয়ে গুছিয়ে রেখেছেন মানুষের জন্য। জন্ম থেকে মানুষ তার চাহিদা অনুযায়ী এই পৃথিবীকে উপভোগ কোরতে থাকে এবং এক পর্যায়ে তাদের ভাবে ভঙ্গিতে মনে হয় যেন এটাই তার জীবন, এটাই তার সবকিছু। কিন্তু তার এই চেতনাকে ভুল প্রমাণ করে একদিন তাকে চলে যেতে হয় এই পৃথিবী ছেড়ে। 'প্রত্যেক আত্মাকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ কোরতে হবে'- এটাই সৃষ্টির অমোঘ নিয়ম। আর মৃত্যুর পরেই কবর জগতে সকল মানুষকে মুখোমুখি হোতে হয় তিনটি প্রশ্নের। একটি কথা এখানে প্রাসঙ্গিক, তা হোল- কবর জগত বোলতে কেবল সাড়ে তিন হাত মাটির ঘরটিকে বোঝানো হয় না। মৃত্যুর পর থেকে পুনরুত্থান পর্যন্ত মানুষের যে সময়টি অতিবাহিত হয়, এ সময়কে বলা হয় 'আলমে বরযখ', সাধারণভাবে বোঝানোর জন্য এ সময়টিকেই আমরা কবর জগত বোলে থাকি কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটা কবর ছাড়াও প্রশ্নোত্তর হোতে পারে। যেমন সনাতন ধর্মের অনুসারীদের শরীর মৃত্যুর পর ভস্মীভূত কোরে ফেলা হয়, তাদের কবর দেওয়া হয় না। তাহোলে কি তারা এই প্রশ্নোত্তর থেকে রেহাই পাবেন? বিষয়টি আসলে তেমন নয়। এসলামের বিষয়ে যাদের ন্যূনতম জ্ঞান আছে তারাও জানেন যে, মৃত্যুর পর প্রতিটি ব্যক্তিকে তিনটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হবে। এ সম্পর্কিত হাদীসটি উল্লেখ কোরছি তাহলে বিষয়টি বুঝতে সুবিধা হবে:

বারা বিন আযিব (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমরা রসুলের সাথে একটি জানাযায় অংশ গ্রহণ কোরেছি। সেখানে রসুলাল্লাহ বোলেছিলেন : তার (কবরবাসীর) নিকট দু'জন মালায়েক আসবে, তারা তাকে বসিয়ে বোলবে: তোমার রব কে? সে বোলবে, 'আমার রব, আল্লাহ'। তারা বোলবে: তোমার দীন কী? সে বোলবে: আমার দীন হোচ্ছে, 'এসলাম'। তারা বোলবে: এই যে ইনি! তোমাদের নিকট পাঠানো হোয়েছিল, তাঁর পরিচয় কী? সে বোলবে: ইনি আল্লাহর রসুল (মুসনাদে আহমদ ও আবু দাউদ)। কোন কোন বর্ণনায় পাওয়া যায়, প্রশ্ন তিনটি হলো যথাক্রমে- (১) মান রাব্বুকা (তোমার প্রতিপালক কে)? (২) ওয়া মান দীনুকা (তোমার জীবনব্যবস্থা কী ছিল)? (৩) ওয়া মান নাবীয়্যুকা (তোমার নবী কে)?

> ১) তোমার রব কে?
> ২) তোমার নবী কে?
> ৩) তোমার দীন কি?

আমাদের সমাজের মোসলেম দাবিদারগণ জীবনের শেষ পর্যায়ে বৃদ্ধকালে এসে এই তিনটি প্রশ্ন উত্তরসহ প্রায়ই মুখস্ত করা ছাড়াও বার বার মুখে আবৃত্তি করেন যাতে কবরে সঠিক উত্তর দিয়ে পার পেতে পারেন। কিন্তু তারা এই সহজ সত্যটুকু বুঝতে পারেন না যে, দুনিয়াতে তার আমলগুলিই এ তিনটি প্রশ্নের উত্তর হিসাবে যথেষ্ট। অর্থাৎ দুনিয়ার জীবনে তারা যাকে প্রতিপালক হিসাবে গ্রহণ কোরেছে, যে যেই জীবনব্যবস্থার উপর দুনিয়ার জীবন পরিচালিত কোরছে এবং যে যার আদর্শ মোতাবেক নিজেকে সাজিয়েছে সেগুলিই সেখানে উত্তর হিসাবে সে উচ্চারণ কোরবে, দুনিয়ার মুখস্তবিদ্যা ওখানে কোন কাজে আসবে না।

এই প্রশ্ন এবং উত্তরগুলোর বিষয়েই সংক্ষিপ্ত আকারে কিছুটা পর্যালোচনা কোরব।

প্রথম প্রশ্নঃ তোমার রব কে? এখানে 'রব' বোলতে শুধু প্রতিপালক বোঝায় না। কারণ, মক্কার মোশরেকরাও আল্লাহকে 'রব' হিসেবে মানতো। মক্কার মোশরেকদের যদি জিজ্ঞাসা করা হতো, বলতো, তোমাদের কে সৃষ্টি কোরেছেন, এই আকাশ-জমিন কে সৃষ্টি কোরেছেন, আশ্রয় দেয়ার মালিক কে, কার হাতে সকল কিছুর কর্তৃত্ব, এই প্রশ্নগুলোর জবাবে তারা বলতো, 'আল্লাহ'। আল্লাহ বলেন: তাদেরকে প্রশ্ন করো, 'কে সাত আসমানের রব এবং মহা আরশের রব'? তারা বোলবে, 'আল্লাহ।' (সুরা মুমিনুনঃ ৮৪-৮৯)। সুতরাং আজ আমরা আল্লাহকে যেভাবে রব বোলে ঈমান পোষণ কোরি সেটুকু ঈমান মক্কার মোশরেক-কাফেরদেরও ছিল। এই ঈমান আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য বা যথেষ্ট হোলে আর নতুন কোরে নবী পাঠানোর কি প্রয়োজন ছিল? প্রকৃতপক্ষে 'রব' শব্দের অর্থ অনেক বিস্তৃত এবং এর প্রধান অর্থ হোচ্ছে প্রভু। অর্থাৎ মানুষটি তার জীবনে কার হুকুমের দাসত্ব কোরেছে, কাকে নিজের সর্বময় কর্তৃত্বকারী সত্ত্বা বা প্রভু বোলে মেনেছে সেটাই জানতে চাওয়া হোচ্ছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, আল্লাহর রসুল তাঁর দাজ্জাল সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণীগুলিতে মানবজাতির প্রতি দাজ্জালের একমাত্র দাবি কি হবে তা জানিয়ে দিয়েছেন, সেটা হোল দাজ্জাল নিজেকে মানবজাতির রব হিসাবে দাবি কোরবে, মা'বুদ বা স্রষ্টা হিসাবে নয়। বর্তমানে কথিত মোসলেম জনসংখ্যাটিসহ সমগ্র মানবজাতি দাজ্জাল অর্থাৎ ইহুদি খ্রিস্টান 'সভ্যতা'কে তাদের 'রব', প্রভু বোলে মেনে নিয়ে জীবনের সর্বাঙ্গনে তার সাজদায় পড়ে আছে। আল্লাহর সার্বভৌমত্ব, তওহীদ অস্বীকার কোরে পাশ্চাত্য সভ্যতাকে সার্বভৌমের আসনে বোসিয়ে রেখেছে। সুতরাং কবরে গিয়ে মালায়েকদের প্রশ্নের উত্তরে ইহুদি খ্রিস্টান সভ্যতাকে নিজেদের রব না বোলে কোন উপায় থাকবে না। বর্তমানে মোসলেম দাবিদার জনসংখ্যাটি সহ সমগ্র মানবজাতিই দাজ্জালের অর্থাৎ ইহুদি খ্রিস্টান 'সভ্যতা'র অঙ্গুলিহেলনে পরিচালিত হোচ্ছে। তারা পশ্চিমা প্রভু-জাতিগুলিকে নিজেদের সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের সোপান ও

নিয়ামক বোলে বিশ্বাস কোরে থাকে। প্রভুদের কৃপা পেলে ধন্য হোয়ে যায়, সর্বত্র সেই কৃপার দানকে গৌরবের সঙ্গে প্রচার কোরতে থাকে। এই ভিক্ষাবৃত্তি কোরেও তারা কোনরূপ লজ্জিত বোধ করে না। নিজেদের দেশের বাজেট করার আগে প্রভুদের দেশে গিয়ে করজোড়ে দাঁড়িয়ে থাকে। অনুদান না পেলে অনাহারে, অশিক্ষায় ধুঁকে মরে। বিদেশীদের দান নিয়ে সরকারগুলি একে অপরের সঙ্গে বিদঘুটে লবিং প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়। পৃথিবীর জীবনে ইহুদি খ্রিস্টান 'সভ্যতা'র এমন হীন গোলামিতে লিপ্ত থেকেও এ জাতি বিশ্বাস করে যে তারা আল্লাহকেই রব মেনে চোলেছে।

দ্বিতীয় প্রশ্নঃ তারা বোলবে: তোমার দীন কি? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে ঐ সকল ব্যক্তিরা ব্যর্থ হোয়ে যাবে যারা এসলামকে নিজের 'দীন' তথা 'জীবনব্যবস্থা' হিসেবে গ্রহণ করে নি। বর্তমানের এই তথাকথিত মোসলেম জনগোষ্ঠী ইহুদি খ্রিস্টানদের তৈরি বিভিন্ন মতবাদ ও তন্ত্রমন্ত্র যেমন গণতন্ত্র, পুঁজিবাদ, সাম্যবাদ ইত্যাদি দিয়ে নিজেদের জীবন পরিচালনা কোরছে। মালায়েকদের প্রশ্নের জবাবে এরা যে যেই ব্যবস্থা মেনে নিয়ে জীবন পরিচালিত কোরেছেন, সেই অনুযায়ী উত্তর দিবেন। যেমন কেউ বোলবেন, আমার দীন গণতন্ত্র, কেউ বোলবেন সমাজতন্ত্র, কেউ বোলবেন একনায়কতন্ত্র, কেউ বোলবেন রাজতন্ত্র ইত্যাদি।

তৃতীয় প্রশ্নঃ তারা বোলবে: এই যে ইনি! তোমাদের নিকট পাঠানো হয়েছিল, তাঁর পরিচয় কি? বা তোমার নবী কে? 'তোমার নবী কে' বোলতে তোমরা তোমাদের জীবনে কার প্রদর্শিত পথ অনুসরণ কোরেছ বা তার নেতা কে ছিল তা জানতে চাওয়া হোচ্ছে। বাস্তব জীবনে মানুষ যে মতাদর্শে বিশ্বাসী, সেই মতবাদের প্রবক্তা ও নেতৃবৃন্দকে তার জীবনাদর্শ বোলে মেনে চোলেছে। রাসুলাল্লাহ বোলেছেন: "তোমাদের মাঝে কেউ ঐ পর্যন্ত মো'মেন হোতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তার প্রবৃত্তি আমি যা নিয়ে এসেছি তার অনুসারী না হবে।" সুতরাং যারা তাদের জীবনে রসুলাল্লাহর কর্মপন্থা বা সুন্নাহ অনুসরণ কোরবে না তারা এই প্রশ্নের উত্তর দিতে ব্যর্থ হবে। তাই তারা যখন মৃত্যুর পর এই প্রশ্নের সম্মুখীন হবে তখন ঐ মতবাদগুলির প্রবক্তা ও নেতাদের নামই উল্লেখ কোরতে বাধ্য হবে। এ প্রশ্নের উত্তরে গণতন্ত্রীরা আব্রাহাম লিংকন বা গণতন্ত্রের অপর কোন পুরোধা ব্যক্তির নাম বোলবেন।' আর সমাজতন্ত্রীরা বোলবেন, "আমার নবী কাল মার্কস অথবা ফ্রেডরিখ এ্যাঙ্গেলস'। যারা রাজতন্ত্রকে মেনে নিয়েছে তাদের উত্তর হবে 'আমার নবী অমুক রাজা।' যারা একনায়কতন্ত্রকে মেনে নিয়েছে তারা বোলবে 'আমার দীন একনায়কতন্ত্র এবং আমার নবী অমুক একনায়ক' ইত্যাদি ইত্যাদি। অর্থাৎ দুনিয়াতে যে যাকে আদর্শ হিসাবে মেনে চোলেছেন ওপারে তার নামই আপনাকে উচ্চারণ কোরতে হবে। আপনি তখন আল্লাহর রসুলকে দেখে চিনতে পারবেন না, কারণ আপনার জীবন তাঁর আদর্শে পরিচালিত হয় নি।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, মৃত্যুর পর মানুষ যে তিনটি প্রশ্নের সম্মুখীন হবে তার একটিরও সঠিক জবাব এই পথভ্রষ্ট মোসলেম জনসংখ্যার কাছে নেই। এমনকি যারা দীনুল হক কায়েম করার সংগ্রামে লিপ্ত, তারাও যদি দীন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আল্লাহর রসুলের প্রদর্শিত পন্থা অনুসরণ না কোরে জনসভা, অনশন, ঘেরাও, মানববন্ধন, মিছিল, লংমার্চ জাতীয় তাগুত প্রদর্শিত পদ্ধতি অবলম্বন করেন তারাও রসুলের সুন্নাহ অনুসরণ কোরছেন না, কোরছেন তাগুতের সুন্নাহ্‌ বা পদ্ধতি। তাদের সকলকেই এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে হোলে আল্লাহর নিজের রচিত, রসুলের রেখে যাওয়া পাঁচ দফার পবিত্র কর্মসূচিটি অনুসরণ কোরতে হবে অর্থাৎ যামানার এমামকে এমাম হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে তাঁর নেতৃত্বে দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম কোরতে হবে।

সুতরাং আজকে আমাদের উচিৎ এমন একটা জীবনব্যবস্থা বা সিস্টেমের উপর জীবন পরিচালিত করা যে সিস্টেমের রব 'আল্লাহ', যে সিস্টেমের জীবনব্যবস্থা 'এসলাম' এবং যে সিস্টেমের আদর্শ 'মোহাম্মদ সঃ।' তবেই আমরা কবরে সঠিক উত্তর দিতে পারবো। নতুবা দুনিয়াতে যেমন– অন্যায়, অশান্তি, জুলুম নির্যাতন, ক্ষুধা, দারিদ্র্য, হীনতা, গোলামী কোরে যাচ্ছি, কবরেও জুটবে কঠিন শাস্তি এবং পুনরুত্থানের পরে আবার স্থায়ী জাহান্নাম।

প্রশ্ন সিস্টেমের উত্তর

ঐশীর চিঠির জবাব

রাকীব আল বান্না

ঐশী, পত্রিকার পাতায় তোমার লেখা চিঠিটি (তুমি যেটাকে সুইসাইড নোট বলেছ সেটা) পড়লাম। তোমাকে নিয়ে লেখা সংবাদ পড়তে পড়তে তোমার প্রতি একটা তীব্র ঘৃণা জন্মেছে সবার মধ্যে কিন্তু আমার মধ্যে জন্মেছিল কৌতুহল, প্রশ্ন। সেই প্রশ্নগুলির কিছু উত্তর পেয়েছি চিঠিটির মধ্যে। ইচ্ছে হোল চিঠির উত্তর লিখবার তাই লিখছি, তবে শুধু তোমার উদ্দেশ্যে নয়, তোমার মতো আরও অনেক ঐশী আমাদের সমাজে আছে এবং সৃষ্টি হবে, তাদের উদ্দেশ্যেও আমার এ লেখা। মানুষ সামাজিক জীব, তাই সমাজের মধ্য দিয়েই তাকে বেড়ে উঠতে হয়। এই সমাজই তার আচার-আচরণ, কৃষ্টি-সংস্কৃতি, চরিত্র ইত্যাদি নিয়ন্ত্রন করে। আর সমাজের সমন্বয়েই গঠিত হয় রাষ্ট্র। কোনো মানুষই মাতৃগর্ভ থেকে অপরাধী হয়ে জন্ম নেয় না, তাকে অপরাধী বানায় এই সমাজ, এই রাষ্ট্রব্যবস্থা। এই সামাজিকতার প্রথম পর্যায় শুরু হয় পরিবার থেকে, পরিবারই তার প্রথম আচার-আচরণগুলি শিক্ষা দেয়। জানি, তুমিও জন্ম নিয়েছিলে নিস্পাপ, নিষ্কলুষ, পবিত্র একটা আত্মা নিয়ে। ছোটবেলা থেকেই হয়তোবা দেখেছ মা-বাবার মধ্যে চরম বিবাদ, ঝগড়া, যে কোনো বিষয় নিয়ে অনৈক্য; হয়তো তোমার বাবাকে দেখেছ তার বাবার সঙ্গে নানা বিষয় নিয়ে খারাপ আচরণ করতে, তোমার মাকে দেখেছ তার মায়ের সাথে খিস্তি-খেউড় করতে; হয়তো দেখেছ তাদের স্বার্থপরতা, আত্মকেন্দ্রিকতা, আরও অনেক অসৎ কর্ম। তখন থেকেই তোমার মনের মধ্যে তোমার মা-বাবার প্রতি শ্রদ্ধার পরিবর্তে জন্মেছে ঘৃণা। ছোট থেকে বড় হয়েছ চার দেয়ালের মধ্যে আবদ্ধ থেকে, যেখানে আলো বলতে বৈদ্যুতিক বাতির আলো, বাতাসও যেন টাকা দিয়ে কেনা আর বিষাক্ত। একটু বড় হলেই পারিবারিক জীবনের পাশাপাশি মিশতে চেয়েছ কিছু বন্ধু-বান্ধবের সাথে, খেলতে চেয়েছ খোলা আকাশের নিচে, কিন্তু পরিবার থেকেই শিখিয়ে দেওয়া হয়েছে, গরিব-ছোটলোকদের সাথে খেলতে নেই, তাদের সাথে না মেশাই ভাল। তোমার পরিবারই মানুষকে মাপা শিখিয়েছে অর্থ-বিত্তের মাপকাঠিতে,

চরিত্রের মাপকাঠিতে নয়। পর্যায়ক্রমে শুরু করেছ তোমার শিক্ষা জীবন। যে শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে তুমি, আমরা সবাই স্নান করছি তা ইহুদি-খ্রিস্টান জড় ও বস্তুবাদী, আত্মাহীন, স্রষ্টাহীন সভ্যতার সৃষ্ট কু-শিক্ষা ব্যবস্থা। এখানে শুধু সেখানো হয় কিভাবে বেশি উপার্জন করা যায়, কিভাবে ভোগ-বিলাস করা যায়, কিভাবে ধনী হওয়া যায় এগুলি, কিন্তু আত্মিক কোনো শিক্ষা এখানে দেওয়া হয় না। নৈতিক শিক্ষা এখানে অনুপস্থিত; সততা, সত্যবাদিতা, ন্যায়পরায়নতা, মহানুভবতা, ত্যাগ, পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব, ঐক্য, শৃঙ্খলা, আনুগত্য ইত্যাদি যেন কোনো শিক্ষার অংশই না। ফলে শিক্ষাঙ্গন থেকেই জন্ম নিচ্ছে সন্ত্রাস, দুর্নীতিবাজ কুশিক্ষিত একটা শ্রেণী, যারা পরবর্তীতে সমাজের বড় বড় চেয়ারে বসে সমাজ পরিচালনা করছে।

এছাড়াও আমরা শিক্ষা গ্রহণ করে থাকি জাতীয় নেতৃবৃন্দের কাছ থেকে, গণমাধ্যমের কাছ থেকে, আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডল থেকে, টেলিভিশন, ইন্টারনেট ইত্যাদি থেকে। কিন্তু আজ শিক্ষা গ্রহণের সকল দ্বারে যেন তালা দিয়ে রেখেছে ইহুদি-খ্রিস্টান বস্তুবাদী, ভোগবাদী, দেহসর্বস্ব আত্মাহীন সভ্যতা। জাতীয় নেতৃবৃন্দ যখন সংসদে দাঁড়িয়ে অপর পক্ষের পরলোকগত নেতৃবৃন্দের গোষ্ঠী উদ্ধার কোরে ছাড়ে, নিজ দেশের বুভুক্ষু জনগণের ত্রাণ কেড়ে নিয়ে বিদেশের ব্যাংকে অর্থ পাচার করে, বস্তাভর্তি টাকা নিয়ে ধরা পড়ে হাতে-নাতে, দুর্নীতি, চাঁদাবাজী, ঘুষ ইত্যাদি অভিযোগে অভিযুক্ত হয় তাদের কাছ থেকে আর কী শিখবে তোমরা। টেলিভিশন, ইন্টারনেট আজ অশ্লীলতার ছোবলে জর্জরিত, ভালর চেয়ে খারাপ অনেক বেশি, শিক্ষার চেয়ে কুশিক্ষা অনেক বেশি। গণমাধ্যমও দুর্নীতি, চাঁদাবাজী, মিথ্যাচার ইত্যাদি অভিযোগ থেকে মুক্ত নয়। আন্তর্জাতিক অঙ্গনের অবস্থা আরও ভয়াবহ সেটা কাওকে বলে দিতে হবে না।

ধর্ম থেকে কিছু শিখবে? সে রাস্তাও আজ কন্টকাকীর্ণ। ধর্মের নামে রাজনীতি, ধর্মের নামে সন্ত্রাস ইত্যাদি কোরে ধর্মের প্রতি মানুষের আজ আর আস্থা নেই। স্বার্থান্বেষী এক শ্রেণীর আলেম মোল্লারা ধর্মকে ব্যাবসায়িক পণ্য বানিয়ে কুক্ষিগত করে রেখেছে, সুতরাং সেখান থেকেও কিছু শিখতে পারছি না আমরা।

কাউকে যদি তুমি স্বাস্থ্যবান দেখতে চাও তবে অবশ্যই তাকে খাবার দিতে হবে, তুমি যদি সোজা চোলতে চাও অবশ্যই রাস্তাটিও সোজা হতে হবে। ঠিক একই ভাবে কাউকে যদি তুমি চরিত্রবান দেখতে চাও তবে অবশ্যই তার জন্য পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। তুমি চিঠিতে তোমার মা-বাবার প্রতি প্রচণ্ড ক্ষোভ ও অভিমান প্রকাশ করেছ, কিন্তু তাদেরইবা দোষ দিই কী করে? তারাও তো তোমার মতোই পরিস্থিতির শিকার, তোমার মতোই অনৈতিক পরিবেশের মধ্য দিয়ে বেড়ে উঠেছে। মানুষ যখন সবার কাছ থেকে আঘাত পায় তখন নীরবে, নির্জনে সৃষ্টিকর্তার কাছে চোখের পানি ফেলে, কিন্তু এই বস্তুবাদী সমাজ তোমাকে সৃষ্টিকর্তার প্রকৃত পরিচয় জানতে দেয় নি, ফলে অজ্ঞতা ও জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার কারণে তুমি সৃষ্টিকর্তার প্রতিও অভিমানের তীর ছুড়েছ। ছোটবেলায় যখন দুষ্টুমি করতে গিয়ে শরীরের কোথাও কেটে যেত তখন মা-বাবা আবার মারতেন- এটা তাদের ভালবাসারই প্রকাশ, ঠিক একই ভাবে আত্মহত্যা মহাপাপ এজন্য যে, সৃষ্টিকর্তা তোমায় অনেক ভালবাসেন, কিন্তু তুমি তা বুঝ নি। তোমার চিঠি পড়ে বুঝতে পারলাম তুমি সুখ খুঁজেছ শুধুই ভোগ-বিলাসিতার মধ্যে যেমনটি এসমাজের আর দশজন খোঁজে। মানুষ তো শুধু দেহসর্বস্ব প্রাণী নয়, তার একটি আত্মাও আছে, তোমার মাঝেও ছিল স্রষ্টার আত্মা, তুমি সে আত্মার ক্রন্দন কখনো শোননি, আত্মার চাওয়া কখনো পূরণ করনি অথবা করতে দেওয়া হয় নি। এ সমাজের প্ররোচনায় ভোগবিলাসে মত্ত হয়ে হীন, নীচ পাশবিক যে কর্মকাণ্ড করেছ তার দহনেই দাহিত হয়ে মারা গেছে তোমার আত্মা, তুমি হয়ে গেছ আত্মাহীন।

শুধু শাস্তি দিয়ে, বিচার করে, আইন তৈরি করে অপরাধ দমানো যায় না, এর জন্য অবশ্যই দরকার সমাজব্যবস্থা, রাষ্ট্রব্যবস্থা তথা সিস্টেমের পরিবর্তন। তুমি যে অপরাধ করেছ তার জন্য তুমি তো একা দায়ী নও, এর জন্য তো এ সমাজের প্রত্যেকেই দায়ী। হয়তোবা তোমার শাস্তি হবে এই পৃথিবীর আদালতে, তোমার অপরাধ কিছুটা হালকা হবে, কিন্তু যে সমাজ তোমাকে এমন অবনতির দিকে ঠেলে দিল তার জন্য এ সমাজের প্রত্যেকের দাঁড়াতে হবে মহান সৃষ্টিকর্তার কাঠগড়ায়।

তুমি যে সিস্টেমের যাঁতাকলে পড়ে নৈতিক অধঃপতনের নিম্নস্তরে পৌঁছে প্রায়ান্ধ হয়ে এমন নিকৃষ্ট কর্মটি করেছ, সে সিস্টেম যদি কার্যকর থাকে তবে তোমার মতোই অনেক শিশু-কিশোর নৈতিক অধঃপতনের অতল গহ্বরে নিপতিত হবে বারংবার। হয়তো সে নিজেকে আত্মাহুতি দিয়ে বিষাদময় পৃথিবীকে বিদায় জানাবে, নয়তো তার পৈশাচিক আচরণের বহিঃপ্রকাশ ঘটাবে অন্য কারো জীবন নিয়ে। কিন্তু তুমি সহ সকল ঐশীদের জন্য আমার কাছে আছে এক অন্য জীবনের সন্ধান, যেখানে মানুষ শুধু মানুষকে ভালবাসে, হিংসা-বিদ্বেষ, হানাহানি, রক্তপাত, দুর্নীতি, নিরাপত্তাহীনতা ইত্যাদির কোনো স্থান নেই সেখানে। আর এই জগৎ থেকে প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে যখন কেউ বিদায় নেবে তখন সে প্রবেশ করবে জান্নাতে। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি নৈতিক অধঃপতনের আগে যদি তোমার সাথে আমার দেখা হত তবে আজকের এই পরিণতি তোমার কখনই ভোগ করতে হত না। তুমিও হতে পারতে একজন সোনার মানুষ, তুমি সবার কাছে পরিচিত হতে এক অন্য ঐশী হিসাবে।

আমি যে জগতের কথা বলছি তা হল আল্লাহর দেওয়া সত্যদীন, দীনুল হক, প্রকৃত এসলাম যা ১৩শ' বছর আগেই হারিয়ে গিয়েছিল, ফলে ক্রমে ক্রমে পৃথিবী আজ অন্যায়, অশান্তিতে পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছে, সমাজ আজ জন্ম দেয় শুধু অসৎ মানুষ। কিন্তু আল্লাহ পাক অশেষ রহম করে সেই প্রকৃত এসলাম আবার বুঝিয়ে দিয়েছেন যামানার এমাম, এমামুয্যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নীকে। আমরা হেযবুত তওহীদ, যামানার এমামের অনুসারীরা মানুষকে সেই সত্য মেনে নিতে আহ্বান করছি। এই সত্যদীন, এই আল্লাহর দেওয়া সিস্টেম মেনে নেওয়ার মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে সেই সুন্দর জগৎ।

ঐশী, জানি না বিচারে তোমার কী রায় হবে, তুমি যদি কখনো জেল থেকে ছাড়া পাও তোমার প্রতি আমার আহ্বান রইল, এই প্রকৃত এসলামে একবার প্রবেশ করলে দেখতে পাবে পৃথিবী কত সুন্দর, পৃথিবীর মানুষগুলি কত সুন্দর, জীবন কত সুন্দর আর এ জীবনের বিনিময়ে পাবে পরকালীন মুক্তি ও সুন্দর জান্নাত। যে পৃথিবীর প্রতি ঘৃণায় তোমার মন বিষিয়ে উঠেছিল, যেখান থেকে তুমি পালাতে চেয়েছিলে কিন্তু পার নি, নিজের কাছে পরাজিত হয়েছ। দেখবে কী সুন্দর পৃথিবী আমরা গড়েছি, জান্নাতের মতো পৃথিবীটাকে সাজিয়েছি। সেই সময় অতি নিকটে।

[লেখক: যামানার এমামের অনুসারী, হেযবুত তওহীদের সদস্য, ফোন: ০১৬৭০১৭৪৬৪৩, ০১৭১১০০৫০২৫]

> *শুধু শাস্তি দিয়ে, বিচার করে, আইন তৈরি করে অপরাধ দমানো যায় না, এর জন্য অবশ্যই দরকার সমাজব্যবস্থা, রাষ্ট্রব্যবস্থা তথা সিস্টেমের পরিবর্তন। তুমি যে অপরাধ করেছ তার জন্য তুমি তো একা দায়ী নও, এর জন্য তো এ সমাজের প্রত্যেকেই দায়ী। হয়তোবা তোমার শাস্তি হবে এই পৃথিবীর আদালতে, তোমার অপরাধ কিছুটা হালকা হবে, কিন্তু যে সমাজ তোমাকে এমন অবনতির দিকে ঠেলে দিল তার জন্য এ সমাজের প্রত্যেকের দাঁড়াতে হবে মহান সৃষ্টিকর্তার কাঠগড়াই।*

কোন পথে মিশর লড়াইটা আসলে কার?

মোহাম্মদ আতাহার হোসাইন

বিক্ষোভ ঠেকাতে এবং রাজপথ থেকে ইখওয়ান কর্মী-সমর্থকদের উচ্ছেদ করতে গিয়ে অভ্যুত্থানকারী সেনাবাহিনী নৃশংস হত্যাযজ্ঞের মধ্য দিয়ে প্রাণ কেড়ে নিয়েছে বহু মানুষের। ইখওয়ানের দাবি মোতাবেক নিহতদের সংখ্যা ২ হাজারের উপরে। আর আহতের সংখ্যা ১০ হাজারেরও বেশী। এদিকে তাদেরকে উচ্ছেদ করার পর ১ মাসের জরুরী অবস্থা জারী করা সত্ত্বেও প্রতিবাদীরা জরুরী অবস্থা ভেঙ্গে রাজপথে নেমে এসেছে। সেনাবাহিনীর সাথে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ছে তারা। অপরদিকে সেনাবাহিনী, সরকার এবং জনতার এই বিপরীতমুখী অবস্থানের দরুন সারা দেশে মানবিক বিপর্যয় দেখা দিয়েছে। যত্রতত্র মারা পড়ছে মানুষ। এমনকি মসজিদও এর বাইরে নয়। মসজিদের ভেতরে পুড়িয়ে হত্যা করা হয়েছে প্রায় তিনশ লোককে। অন্যদিকে দেশে দেখা দিয়েছে গৃহযুদ্ধের আশংকা। সামরিক বাহিনীর একতরফা দমননীতির ফলে তাদের নিজেদের মধ্যেও ভাঙ্গনের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। হত্যাকাণ্ডের দায় স্বীকার না করতে দেশ ছেড়ে অস্ট্রিয়ায় চলে গেছেন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের পদত্যাগী ভাইস প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ আল বারাদি। তবে আল বারাদি সামরিক অভ্যুত্থানের অব্যবহিত পরে এই অভ্যুত্থানকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। এদিকে, মিশরের সেনানিয়ন্ত্রিত সংবাদ মাধ্যমগুলো জানিয়েছে দফায় দফায় সহিংসতায় মানুষের প্রাণহানির পর করণীয় নির্ধারণ করতে বৈঠকে বসছে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মন্ত্রিপরিষদ।

এদিকে ব্রাদারহুডের সঙ্গে কোনো ধরনের সমঝোতা সংলাপে না বসে তাদেরকে নিষিদ্ধ করার পরিকল্পনায় সরকার এগোচ্ছে বলে প্রধানমন্ত্রী হাজেম এল বেবলায়ির বক্তব্য থেকে স্পষ্ট বোঝা গেছে। পর্যবেক্ষকরা বলছেন, দু'পক্ষের অনড় অবস্থান এবং ব্রাদারহুডকে নিষিদ্ধ করার পরিকল্পনা মিশরের জন্য চরম আত্মঘাতী পদক্ষেপ হবে।

ওদিকে আবার মুরসির গ্রেফতারকৃত সমর্থকদের ওপর পুলিশের কারাগারে বর্বরোচিত হামলায় অন্তত ৪০ জন নিহত হয়েছে। রাজধানী কায়রোর উপকণ্ঠে একটি কারাগারে রোববার সন্ধ্যায় এ হামলা হয়েছে বলে প্রেসটিভি জানিয়েছে। মিশরের রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত সংবাদ সংস্থা মেনা অবশ্য নিহতের সংখ্যা ৩৬ বলে উল্লেখ করেছে। এ খবরে দাবি করা হয়েছে, মুরসির সমর্থকরা 'জেল ভেঙে' পালানোর চেষ্টা করার সময় তাদের ওপর গুলিবর্ষণ করা হয়।

মেনার খবরে বলা হয়েছে, অজ্ঞাত বন্দুকধারীরা বাইরে থেকে কারাবন্দীদের পালিয়ে যেতে সহায়তা করে। তারা একজন পুলিশ কর্মকর্তাকে অপহরণ করেছে বলেও বার্তা সংস্থাটি দাবি করেছে।

এর আগে মিশরের পুলিশ জানায়, মুরসির সমর্থক ইখওয়ান কর্মীদের কায়রোর উত্তর অংশে অবস্থিত আবু জাবাল কারাগারে স্থানান্তরের সময় তারা 'দাঙ্গা সৃষ্টি করে' পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। এ সময় পুলিশ তাদের ওপর টিয়ারগ্যাস নিক্ষেপ করে। মিশরের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে বলেছে, ইখওয়ানের বন্দিরা পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে পুলিশ তার 'করণীয়' করেছে মাত্র।

অন্যদিকে উত্তরাঞ্চলীয় সিনাই উপত্যকায় অজ্ঞাত দুর্বৃত্তদের হামলায় ২৪ জন পুলিশ নিহত হয়েছে। দেশটির নিরাপত্তা কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, পুলিশের দু'টি মিনিবাসে রকেট চালিত গ্রেনেড দিয়ে হামলা চালায় দুর্বৃত্তরা। সোমবার সকালে রাফাহ শহরের কাছে এ হামলা হয়। তবে হামলায় কারা জড়িত ছিল তা নিশ্চিত না হলেও ধারণা করা হচ্ছে ইখওয়ান কর্মীরাই এই কাজ করে থাকতে পারে।

সার্বিক পরিস্থিতিতে মিশর এখন এক অগ্নিগর্ভ। একটার পর একটা সংঘর্ষ এবং হত্যাকাণ্ড ঘটেই চলেছে। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় মিশরের পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে আসছে। কিন্তু সবচাইতে উস্কানীমূলক এবং বিপদজনক খেলাটি খেলছে সৌদি আরবের রাজকীয় কর্তৃপক্ষ। এর আগে খবরে প্রকাশ সৌদি বাদশাহ সামরিক বাহিনীকে ১ শ কোটি ডলার ঘুষ প্রদান করে অভ্যুত্থান ঘটাতে প্ররোচিত করেছে। এত মানুষের প্রাণহানীর পরেও সৌদি রাজপরিবার সেনাবাহিনীকে সমর্থন অব্যাহত রেখেছে। সামরিক সরকারকে এই হত্যাকাণ্ডে চাপ প্রয়োগ না করতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেছে। সৌদি সরকার এমন সময় এই হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করলো যখন মিসর পরিস্থিতি পর্যালোচনায় ব্রাসেলসএ চলতি সপ্তাহেই ইউরোপীয় ইউনিয়নের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের বৈঠক অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। রোববার ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ফ্রাঁসোয়া ওলান্দের সাথে এক বৈঠকের পর সৌদি পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রিন্স সৌদ আল ফয়সাল এ হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেন। সার্বিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে বিশ্লেষকগণ মনে করছেন সৌদি রাজতন্ত্র ও প্রশাসন মিশরের ঘটনায় খলনায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। আড়ালে বসে তারাই মূলত কলকাঠি নাড়ছে। তাদের ভয় মিশরের পথ অনুসরণ করে না আবার তার দেশের মানুষ রাজতন্ত্রের 'তখ্‌ত-তাউশের' প্রতি হুমকি হয়ে দাঁড়ায়, তাদের ভোগ বিলাসীতায় না আবার মানুষ বাঁধ সাধে। অথচ ইসলামের পত্তন যে মাটিতে হয়েছে, যারা আল্লাহর ঘর ক্বাবার রক্ষণাবেক্ষণে নিয়োজিত আছেন তাদের কোনমতেই মিশরের জনগণের প্রতি এই আচরণ প্রদর্শন করা উচিত হয় নি। বরং উচিত ছিলো তাদেরকে সাহায্য সহযোগিতা করে উভয় পক্ষের বিবাদ মিটমাট করে দেওয়া। মিশরে বিবাদমান দু'টি পক্ষই অন্ততপক্ষে দাবিদার হোলেও মুসলমান। এই দুইটি অংশ পরস্পর পরস্পরের সাথে লড়াই করে মূলত নিজেদের শক্তিকে আরো নষ্ট করছে। লাভবান হচ্ছে পার্শ্ববর্তী দখলদার শক্তি ইসরাইল। রসুলের জন্মভূমিতে আজ যারা প্রতিষ্ঠিত, উম্মাহর ঐক্যের প্রতীক ক্বাবা যেখানে উপস্থিত- সেই তারাই যখন জাতির ঐক্যের এমন ক্ষতি করতে পারে; তখন তাদেরকে মুসলমান মনে করতে মানুষের সন্দেহ আসতেই পারে। মনেই হতে পারে যে তাদের সাথে ইহুদিদের যোগসাজস রয়েছে। কারণ মিশরের কোমড় ভেঙ্গে দিতে পারলে ইসরাইল যথাযথই খুশি হবে। ফিলিস্তিনকে গিলে খাওয়াটা তাদের জন্য আরো নিরাপদ হয়ে উঠবে। এই কাজটাই তারা সহজ করে দিচ্ছে।

তাই মিশরের সার্বিক পরিস্থিতিতে বলা যায়- যারা রাজপথে, মাঠে ময়দানে লড়াই করছে- তাদের লড়াইটা মূলত সেনাবাহিনীর সাথে নয়। লড়াইটা সৌদি আরবের সাথে। তাই সৌদি আরবের রাজতান্ত্রিক সরকার এত এত নগদ ডলার ব্যয় করছে- লাজ লজ্জা খুইয়ে মিশরের খুনি সামরিক সরকারকে হত্যাকাণ্ডে সমর্থন অব্যাহত রেখেছে। আর অন্যদিকে ইখওয়ানও কোন ইসলাম শিখে এভাবে নিরস্ত্র অবস্থায় সশস্ত্র বাহিনীর সম্মুখীন হচ্ছে? এটাকে কি ঈমান বলে, নাকি এটা বোকামী। ইসলাম এই অর্থেই আত্মহত্যাকে নিষেধ করেছে। রসুলাল্লাহ্ মক্কায় থাকতে বিরোধীদের অত্যাচারেও প্রতিবাদ করেন নি এজন্য যে তিনি তখনও শক্তি অর্জন করতে পারেন নি ততদিন তিনি সংঘর্ষ এড়িয়ে চলেছেন। তিনি একটি মদীনা জীবনের জন্য অপেক্ষা করেছেন। যখন তাঁর হাতে মদিনা এসেছে তখন তিনি আর কাউকে পরোয়া করেন নি। মক্কায় থাকা অবস্থায় লড়াই করতে যাওয়াটাও সেই আত্মহত্যার সামিল।

আসুন সিস্টেমটা পাল্টাই

একজন মোজাহেদের জীবন

হেযবুত তওহীদের মোজাহেদ মোহাম্মদ রাসেল

আল্লাহর রসুলের সময়ে জন্ম নেই নি, তাঁর আসহাব হোতে পারি নি- এজন্য আমার মনে খুব কষ্ট ছিল। যামানার এমামের সংস্পর্শে এসে আমার সেই কষ্ট সম্পূর্ণ দূর হোয়ে গেছে। মহানবীর আসহাবরা আল্লাহর তওহীদের দিকে মানুষকে আহ্বান কোরেছেন, আল্লাহর সত্যদীন প্রতিষ্ঠার জন্য নিজেদের জীবনকে উৎসর্গ কোরেছেন। আজ ১৪০০ বছর পর সেই তওহীদের সন্ধান পেয়েছি এবং পৃথিবীময় সত্যদীন প্রতিষ্ঠার জন্য আত্মনিয়োগ কোরতে পেরেছি, এই জন্য আমি ধন্য। আমার জীবন আরও ধন্য এই জন্য যে, আমি দাজ্জালের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার সুযোগ লাভ কোরেছি। আমার জীবনসম্পদ সবকিছু কোরবান কোরে একজন সত্যিকার মোমেন ও উম্মতে মোহাম্মদী হওয়ার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা কোরছি।

আমাদের গ্রামের নরুল হক মেম্বারের বাড়িতে তার বড় ছেলে বড় মিয়া গ্রামের সবাইকে তওহীদের বালাগ দিতেন। তখন অনেকে বিরোধিতা কোরত, আবার কিছু সংখ্যক মানুষ তার কাছে বোঝার জন্য যেতো। আমার মা ও খালাসহ অন্যান্য কিছু মহিলা ঐ বাড়িতে মিটিং-এ যেতেন। তখন ছোট থাকায় আমিও মায়ের সাথে যেতাম। কিছুদিন পর আমার মা হেযবুত তওহীদে যোগদান করেন। ঐ বয়সেই তওহীদের

> *"প্রতিবারই আমি তাদেরকে চিৎকার কোরে বোলি, "হেযবুত তওহীদ নিষিদ্ধ নয়, হেযবুত তওহীদ সত্য, হেযবুত তওহীদ হক, এর এমাম হক, হেযবুত তওহীদ দিয়ে সারা পৃথিবীতে দীন প্রতিষ্ঠিত হবে, আপনারা বেঁচে থাকলে দেখবেন এনশা'আল্লাহ।"*

এই ডাক আমাকে ভীষণভাবে নাড়া দেয়। সারাক্ষণ আমি এই তওহীদ নিয়েই ভাবতে থাকি। তারপর আমি বুঝতে পারি যে, এই দুনিয়া এবং আখেরাতে মুক্তি পেতে হলে হেযবুত তওহীদে যোগদান করা ছাড়া আর কোন পথ নাই। তখন আমি আমার মায়ের অনুমতি নিয়ে ২০০৬ সালে আমিরের হাতে বায়াত গ্রহণ করি। তারপর ২০০৭ সালে ১৫ বছর বয়সে আমি আমাদের মাননীয় এমামুয্যামানের সাথে হেজরতে অংশগ্রহণ করি। হেজরতে জাহাজে এমামুয্যামানের সাথে আমার একবার দেখা হয়। তিনি আমাদের বোললেন, "তোমরা সবাই তৈরী হও। নিজেদের চরিত্র গঠন করো।" আমি কয়েকবার অসুস্থ অবস্থায় এমামুয্যামানের চিকিৎসা গ্রহণ করি এবং ঔষধ খেয়ে আমি খুব শান্তি পাই। আমি অনেক অসুস্থ ছিলাম, প্রায় প্রতিবন্ধীদের মত, আমার কথা এতই অস্পষ্ট ছিল যে কিছুই বোঝা যেত না। আমি ছিলাম সবার মধ্যে অবহেলিত। তওহীদ গ্রহণের পর আল্লাহর রহমে এবং এমামুয্যামানের চিকিৎসায় ও দোয়ায় আমি সুস্থ হোয়ে যাই, কথা বোলতে পারি এবং মানুষকে আমি তওহীদের বালাগ দেই। এমমুয্যামানের সাথে কয়েকটি মিটিং এ অংশগ্রহণ কোরে তাঁর কথা শোনার সুযোগ আমার হয়।

২০০৯ সালে মো'জেজা বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানের সময় আমাদের গ্রামের ধর্মব্যবসায়ী মোল্লারা আমাদের উপর ক্ষিপ্ত হোয়ে সমস্ত গ্রামবাসীকে খ্রিস্টান, মুরতাদ ইত্যাদি বোলে গুজব ছড়ায় এবং ফতোয়া দেয় যে এদেরকে মারতে পারলে তোমরা জান্নাতে যাবে। এভাবে তারা গ্রামবাসীদেরকে উত্তেজিত কোরে তোলে। তখন মোল্লাদের প্ররোচনায় সন্ত্রাসীরা আমাদেরকে আক্রমণ করে। প্রায় তিন ঘণ্টা ধোরে এই আক্রমণ চালানো হয়। এরপর পুলিশ এসে আক্রমণকারীদেরকে কিছু না বোলে উল্টো আমাদের নারী, বাকি অংশ ২৯ পৃষ্ঠায়

অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি সমান?

মোহাম্মদ মসীহ উর রহমান

সূর্য্য চর্মচক্ষুতে দেখা যায়, কিন্তু এই সূর্য্যের যিনি স্রষ্টা ও নিয়ন্ত্রক তাঁকে দেখতে প্রয়োজন অন্তর্চক্ষু

মানুষের চোখ দুই প্রকার। একটা সাধারণ চর্মচক্ষু- যা দিয়ে আমরা পৃথিবীর রং, রূপ, প্রকৃতি, চন্দ্র, সূর্য্য, পাহাড়, পর্বত প্রভৃতি দেখি। মানুষের আরেকটি যে চক্ষু রয়েছে তা হলো অন্তর্চক্ষু। এই চক্ষু দিয়ে আমরা উপলব্ধি করি এক মহাসত্যকে। তা হলো চর্মচক্ষে দেখা এই সৃষ্টির পেছনের আসল রহস্য কি, আসল সত্য কি! এই মহাজগতে সত্য দুই ধরণের। এর একটি সাধারণ চর্মচক্ষু দিয়ে দেখা যায়। অপর মহাসত্যটি এই চর্মচক্ষু দিয়ে দেখা যায় না। এই মহাসত্যকে দেখার জন্য দরকার হয় সেই অন্তর্চক্ষুর। যেমন সূর্য্য একটা সত্য- এই সূর্য্য চোখে দেখা যায়। এর আলো, তাপ সবই দেখে উপলব্ধি করা যায়। সকাল বেলায় কিভাবে স্নিগ্ধ আলো বিকিরণ করে, মধ্যাহ্নে তার প্রখর মূর্তি আবার অস্তগামী সূর্য্যের অনন্য শোভা এই চোখ দিয়ে দেখা যায়। এই চোখ দিয়ে দেখা যায় একটা সুন্দর গোলাপকে। বহু বর্ণের গোলাপ আমরা দেখি, এর রূপকে উপলব্ধি কোরি। সবুজ বন-বনানী, খোলা মাঠ, বাতাসে দোল খাওয়া ধানের শীষ- এগুলো দেখতে হলেও চোখ থাকতে হয়। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের এই অবলোকন হৃদয়ে অনাবিল সুখ সৃষ্টি করে। আবার খারাপ জিনিস মনে ঘৃণাবোধের সৃষ্টি করে। এক কথায় ভালো আকর্ষণ করে, মন্দ বিকর্ষণ করে।

অন্যদিকে যে জন্ম থেকে অন্ধ, জীবনে কোনদিন আলো দেখেনি, তাকে শত চেষ্টা করে, শত উদাহরণ দিয়েও আলো কি তা বোঝানো যাবে? তাকে কি বোঝানো যাবে গোলাপ কি, গোলাপের রং লাল, কালো, গোলাপী বলতে কি বোঝায়? সবুজ কি, সবুজ ধানের মাঠ বাতাসে দোল খেলে কেমন দেখায়? যার চোখ আছে সে দেখে হরিণের মায়াবী চোখ, সে দেখে ময়ূরের পেখম মেলার দৃশ্য কেমন মনোহর। যার চোখ নেই তার কাছে সুন্দর অসুন্দরে কোন প্রভেদ নেই। সত্য দেখার জন্য যেমন অন্তর্চক্ষু দরকার তেমনি মিথ্যা দেখার জন্য অন্তর্চক্ষু দরকার। মাকাল ফল বাইরে থেকে দেখতে অতি মনোরম কিন্তু যে জানে এর ভিতরে কি আছে সে কিন্তু কখনওই এই ফল খাবে না। যে জানে না, সে এটা অবশ্যই খেতে চাইবে। মানবজাতির অন্তর্চক্ষু যদি অন্ধ হয় সেও তেমনি বুঝতে পারবে না, কে তার শুভাকাঙ্ক্ষী আর কে তার ধ্বংসকামী। এই সভ্যতার অন্তর্চক্ষু নেই, এর অনুসারীরাও তাই সত্য বিমুখ। শত হাজারবার সত্যকে দেখানোর চেষ্টা করা হোলেও তা যেন বৃথা, কারণ ঐ অন্ধের মত অন্তর্চক্ষু না থাকায় সত্যকে তারা দেখে না, বোঝে না। যেহেতু দেখেও না, বোঝেও না। কাজেই সত্য-সুন্দর তার আত্মায় কোন প্রভাবও সৃষ্টি করে না। আল্লাহর রসুল বোলেছেন– দাজ্জালের ডান চোখ অন্ধ হবে। [আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) থেকে বোখারী ও মোসলেম]

দাজ্জালের ডান চক্ষু অন্ধ হবে অর্থ সে ডান চোখ দিয়ে কিছুই দেখতে পাবে না, যা দেখবে সবই বাঁ চোখ দিয়ে। আল্লাহ যা কিছু তৈরী কোরেছেন সব কিছুরই দু'টো বিপরীত দিক আছে। এই মহাসৃষ্টিও দৃশ্য ও অদৃশ্য, কঠিন ও বায়বীয়, আলো ও অন্ধকার, আগুন ও পানি, দিন ও রাত্রি ইত্যাদি বিপরীত জিনিসের ভারসাম্যযুক্ত মিশ্রণ। এই পৃথিবীতে আল্লাহ তাঁর যে খলীফা পাঠালেন সেই মানুষের জন্যও তিনি নির্ধারিত কোরলেন বিপরীতমুখী

বিষয়। তার জন্যও তিনি নির্দিষ্ট কোরলেন দেহ ও আত্মা, জড় ও আধ্যাত্মিক, সত্য ও মিথ্যা, সওয়াব ও গোনাহ, ভালো ও মন্দ, ইহকাল ও পরকালের ভারসাম্যযুক্ত সমন্বয়। এই দুইয়ের ভারসাম্যই হোচ্ছে স্বাভাবিক, প্রাকৃতিক। তাঁর এই খলীফার জন্য যে দীন, জীবন-বিধান তিনি তাঁর নবী-রসুলের মাধ্যমে প্রেরণ কোরলেন সেটার এক নাম দীনুল ফিতরাহ, প্রাকৃতিক, স্বাভাবিক জীবন-ব্যবস্থা এবং সেই দীন যারা মেনে চোলবে আল্লাহ তাদের নাম দিলেন মিল্লাতান ওয়াসাতা, ভারসাম্যযুক্ত জাতি (কোরান- সুরা বাকারা, আয়াত ১৪৩)। এই ভারসাম্যের দু'দিকের যে কোন দিককে বাদ দিলেই ভারসাম্য নষ্ট হোয়ে যাবে ও অস্বাভাবিক অপ্রাকৃতিক অবস্থার সৃষ্টি হবে এবং আল্লাহ তাঁর খলীফা, মানুষ সৃষ্টি কোরে যে পরীক্ষা কোরতে চান তা ব্যর্থ হোয়ে যাবে। যেমন আজকে হোয়েছে।

পথভ্রষ্ট বনি-এসরাঈল জাতিকে হেদায়াত করার জন্য প্রেরিত আল্লাহর নবী ঈসার (আঃ) প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবার পর তাঁর শিক্ষাকে ইউরোপের সমষ্টিগত জীবনে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা একটা অচল অবস্থার সৃষ্টি কোরলো। রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাবিহীন একটা ভারসাম্যহীন ব্যবস্থা, যেটার উদ্দেশ্যই ছিলো শুধু আত্মশুদ্ধির পরিত্যক্ত প্রক্রিয়াকে (তরিকা) পুনঃপ্রতিষ্ঠা, সেটা মানুষের সার্বিক জীবনে অচল এটা সাধারণ জ্ঞানেই (Common sense) বোঝা যায়। এই অচল ব্যবস্থাকে চালু করার চেষ্টা ব্যর্থ হোলে ইউরোপ যখন মানুষের সমষ্টিগত জীবনের সার্বভৌমত্ব আল্লাহর হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে নিজেদের হাতে তুলে নিয়ে সংবিধান, রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক, আইন-কানুন, দণ্ডবিধি তৈরী কোরে নিলো তখন তারা জীবনের ভারসাম্য সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস কোরে ফেললো। দু'চোখ দিয়ে না দেখে এক চোখ অন্ধ কোরে শুধু এক চোখ দিয়ে দেখতে শুরু কোরলো। অন্ধ কোরলো ডান অর্থাৎ দক্ষিণ চোখটাকে।

এই জাতির মধ্যে কয়েকটি দেশ আছে যাদের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের কপালে সাজদার কালো দাগ আছে কিন্তু তারা দাজ্জালের আশ্রয়ে থেকে, দাজ্জালের কাছ থেকে অস্ত্রসহ সবরকম সাহায্য নিয়ে তাদের দেশের মধ্যে যারা আল্লাহর সার্বভৌমত্ব, তওহীদ প্রতিষ্ঠা কোরতে চান তাদের বন্দী কোরছেন, নির্যাতন কোরছেন, গুলী কোরে ফাঁসি দিয়ে হত্যা কোরছেন। এর কারণ এসব নেতাসহ মোসলেম বিশ্ব দাজ্জালের শেখানো এই কথা বিশ্বাস কোরে নিয়েছেন যে ধর্ম ব্যক্তিগত বিষয়, সমষ্টিগত নয়, তাই তারা দাজ্জালের কপালে কাফের লেখা দেখতে ও পড়তে পারেন না। কারণ মো'মেন না হওয়ার কারণে তাদের অন্তর্দৃষ্টি অন্ধ, দাজ্জালের মত তাদেরও ডান চোখ অন্ধ।

ডান এবং বামের মধ্যে ডানকে নেয়া হয় উত্তম ও বামকে নেয় হয় অধম হিসাবে। কেয়ামতের দিন জান্নাতীদের আমলনামা, তাদের কাজের রেকর্ড বই দেয়া হবে ডান হাতে, জাহান্নামীদের দেয়া হবে বাম হাতে (সুরা হাক্কাহ, আয়াত ১৯, ২৫ ও সুরা ইনশিকাক, আয়াত ৭)। দেহ ও আত্মার মধ্যে আত্মা ডান দেহ বাম, সত্য ও মিথ্যার মধ্যে সত্য ডান মিথ্যা বাম, ইহকাল ও পরকালের মধ্যে পরকাল ডান, ইহকাল বাম, জড় ও আধ্যাত্মের মধ্যে আধ্যাত্ম ডান, জড় বাম ইত্যাদি। ইহুদী-খ্রিস্টান বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতার (Judeo-Christian Materialistic Civilization) ডান চোখ অন্ধ অর্থাৎ জীবনের ভারসাম্যের একটা দিক, আত্মার দিক, পরকালের দিক, অদৃশ্যের (গায়েব) দিক, সত্যের দিক সে দেখতে পায় না, তার সমস্ত কর্মকাণ্ড জীবনের শুধু একটা দিক নিয়ে, দেহের দিক, জড় ও বস্তুর দিক, যন্ত্র ও যন্ত্রের প্রযুক্তির দিক, ইহকালের দিক, কারণ শুধু বাম চোখ দিয়ে সে জীবনের ঐ একটা দিকই দেখতে পায়। তাই বিশ্বনবী বোলেছেন, দাজ্জালের ডান চোখ অন্ধ হবে। এই ইহুদী-খ্রিস্টান বস্তুবাদী 'সভ্যতা' শক্তিশালী দূরবীন দিয়ে তার বাঁ চোখ দিয়ে এই মহাবিশ্ব, এই বিশাল সৃষ্টিকে দেখতে পায়। কিন্তু তার ডান চোখ অন্ধ বোলে এই সৃষ্টির স্রষ্টাকে দেখতে পায় না; অণু-পরমাণু থেকে শুরু কোরে বিশাল মহাকাশ পর্যন্ত প্রত্যেকটি বস্তু যে এক অলংঘনীয় বিধানে বাঁধা আছে তা দাজ্জাল তার বাঁ চোখ দিয়ে দেখতে পায়, কিন্তু ডান চোখ নেই বোলে এই মহাবিধানের বিধাতাকে দেখতে পায় না। শিশুর জন্মের আগেই মায়ের বুকে তার খাবারের ব্যবস্থা করা আছে তা দাজ্জালের চিকিৎসা বিজ্ঞান তার বাঁ চোখ দিয়ে দেখতে পায়, কিন্তু যিনি এ ব্যবস্থা কোরে রেখেছেন সেই মহাব্যবস্থাপককে, মহাপ্রভু আল্লাহকে সে দেখতে পায় না, কারণ তার ডান চোখ অন্ধ।

দাজ্জাল তার আত্মাহীন জড়বাদী মতবাদের প্রভাবে মানব জাতির অন্তর্চক্ষুকে একেবারে বন্ধ কোরে দিয়েছে। কাজেই সত্যের কথা যতই বলা হোক, যতভাবেই বোঝানোর চেষ্টা করা হোক দাজ্জালের অনুসারীরা আর সত্যকে দেখতে পায় না, বোঝার চেষ্টাও করে না। এই 'সভ্যতা' মহাবিশ্বের স্রষ্টাকে মানবজীবনের সামষ্টিক অঙ্গন থেকে নির্বাসিত কোরেছে, মিথ্যার চাদরে দুনিয়াকে আচ্ছাদিত কোরে ফেলেছে। মানুষ তার প্রভাবে আজ প্রায় পশুতে পরিণত হোয়েছে। তা সত্ত্বেও মানুষ এই ইহুদী খ্রিস্টান সভ্যতাকেই ভালোবাসছে, প্রাণপণে তার অনুসরণ-অনুকরণ কোরে যাচ্ছে। এটা তারা কোরছে তাকে চিনতে না পারার কারণে। রসুলাল্লাহ বোলে গেছেন, "দাজ্জালের দুই চোখের মাঝখানে (অর্থাৎ কপালে) কাফের লেখা থাকবে। শুধু মো'মেন, বিশ্বাসীরাই তা দেখতে এবং পড়তে পারবে; যারা মো'মেন নয়, তারা পড়তে পারবে না [আবু হোরায়রা (রাঃ), আবু হোযায়ফা (রাঃ) এবং আনাস (রাঃ) থেকে বোখারী ও মোসলেম]।

এই হাদীসটি শুধু অর্থবহ এবং আকর্ষণীয় নয়, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণও বটে। মো'মেন হোলে লেখাপড়া না জানলেও, নিরক্ষর হোলেও তারা পড়তে পারবেন আর মো'মেন না হোলে, শিক্ষিত হোলেও, পণ্ডিত হোলেও দাজ্জালের কপালে কাফের লেখা দেখতে ও পড়তে পারবেন না, এই কথা থেকেই এটা পরিষ্কার যে, দাজ্জালের কপালের ঐ লেখা কাফ, ফে, রে এই অক্ষরগুলো দিয়ে লেখা নয়। মো'মেনরা নিরক্ষর হলেও ঐ লেখা দেখতে ও পড়তে পারবেন। মো'মেন কারা? আল্লাহ কোর'আনে বোলেছেন- শুধু তারাই মো'মেন যারা আল্লাহ ও তাঁর রসুলকে বিশ্বাস করে, তারপর আর তাতে কোন সন্দেহ করে না, এবং তাদের প্রাণ ও সম্পদ দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করে; তারাই হোল খাঁটি (সূরা হুজরাত ১৫)।

এখানে মনে রাখতে হবে যে 'যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলকে বিশ্বাস করে' এ কথার অর্থ যারা আল্লাহর সর্বব্যাপী সার্বভৌমত্বে বিশ্বাস করে, জীবনের প্রতি বিভাগে, প্রতি অঙ্গনে আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে স্বীকার করে না। দাজ্জালকে রব বোলে স্বীকার কোরে নেয়ায় প্রায় সম্পূর্ণ মোসলেম দুনিয়া আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে ব্যক্তি জীবনে কোণঠাসা কোরে রেখে আকীদার (Comprehensive Concept) বিকৃতির কারণে কার্য্যতঃ মোশরেক ও কাফের হোয়ে গেছে। কাজেই বৃহত্তর জীবনে দাজ্জালের কপালে কাফের লেখা অর্থাৎ দাজ্জাল যে সমষ্টিগত জীবনে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব অস্বীকারকারী কাফের এটা তারা দেখতেও পান না সুতরাং পড়তেও পারেন না। কিন্তু জীবনের প্রতি অঙ্গনে আল্লাহর সার্বভৌমত্বে যিনি বিশ্বাসী, অর্থাৎ মো'মেন তিনি নিরক্ষর হোলেও দাজ্জাল যে কাফের তা দেখতে ও বুঝতে পারেন অর্থাৎ তার কপালে কাফের লেখা পড়তে পারেন।

আজ মোসলেম বোলে পরিচিত এই জাতিটির প্রায় সমস্ত মানুষ দাজ্জালকে রব বোলে স্বীকার কোরে নিয়েছে কিন্তু ওদিকে মহা-পরহেযগার, মুত্তাকী। এমন কি এই জাতির মধ্যে কয়েকটি দেশ আছে যাদের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের কপালে সাজদার কালো দাগ আছে কিন্তু তারা দাজ্জালের আশ্রয়ে থেকে, দাজ্জালের কাছ থেকে অস্ত্রসহ সবরকম সাহায্য নিয়ে তাদের দেশের মধ্যে যারা আল্লাহর সার্বভৌমত্ব, তওহীদ প্রতিষ্ঠা কোরতে চান তাদের বন্দী কোরছেন, নির্যাতন কোরছেন, গুলী কোরে ফাঁসি দিয়ে হত্যা কোরছেন। এর কারণ এসব নেতাসহ মোসলেম বিশ্ব দাজ্জালের শেখানো এই কথা বিশ্বাস কোরে নিয়েছেন যে ধর্ম ব্যক্তিগত বিষয়, সমষ্টিগত নয়, তাই তারা দাজ্জালের কপালে কাফের লেখা দেখতে ও পড়তে পারেন না। কারণ মো'মেন না হওয়ার কারণে তাদের অন্তর্দৃষ্টি অন্ধ, দাজ্জালের মত তাদেরও ডান চোখ অন্ধ।

সমস্ত সত্য ও সুন্দরের আধার হচ্ছেন আল্লাহ। তিনি হোলেন সমস্ত ন্যায় ও কল্যাণের উৎস। তারপরে সত্য হলো তাঁর সৃষ্টিকূল। তার সৃষ্টির মধ্য দিয়েই তিনি তাঁর মাহাত্ম্য ও সৌন্দর্য্যের প্রকাশ ঘটিয়েছেন। তাঁর মধ্যে তাঁর প্রেরিত নবী রসুলগণ অগ্রগণ্য। তারপরে সত্য হোল মো'মেনগণ। সুতরাং আল্লাহর সত্যের প্রকাশ হোচ্ছে নবী রসুল, আল্লাহর নাজেলকৃত সত্যদীন এবং এই দীনের ধারক মো'মেনগণ। দাজ্জালের জড়বাদী ধারণার প্রভাবে যাদের অন্তর্চক্ষু অন্ধ হোয়ে গেছে তাদেরকে হাজার বার বোঝালেও তারা এই সত্যগুলিকে দেখতে পাবে না, এর সৌন্দর্য্য তাদের কাছে অজ্ঞাতই থেকে যাবে। অন্ধের কাছে যেমন সব রংই অন্ধকার তেমনি অন্তর্দৃষ্টি না থাকায় এই সভ্যতার উপাসকেরা এখন আঁধার ছাড়া আর কিছুই দেখে না। তাদের জন্য আল্লাহর এই কথাই প্রযোজ্য: তাদের হৃদয় আছে কিন্তু তা দিয়ে তারা বোঝে না। তাদের চোখ আছে কিন্তু তা দিয়ে তারা দেখে না এবং তাদের কান আছে কিন্তু তা দিয়ে তারা শোনে না-এরা পশুর মতো, বরং তার চেয়েও ভ্রষ্ট (সূরা আরাফ ১৭৯)।

আমার এ লেখা থেকে পাঠক হয়তো ভাবছেন যারা দাজ্জালের অনুসারী তারা সত্যকে দেখতে পায় না, কিন্তু যারা ধর্ম নিয়ে আছেন তারা নিশ্চয়ই সত্যকে দেখতে পান। কিন্তু না। এই ধারণা গুরুতর ভুল। তারা আসলে ধর্মের অন্তর্নিহিত সত্যকে প্রত্যাখ্যান কোরেছে, ধর্মের খোলস ধারণ কোরে ধর্মকে পূজি কোরে খাচ্ছে। ধর্মের অন্তর্নিহিত সত্য কি? সেটি বলার জন্য আল্লাহর একটি আয়াত উল্লেখ কোরছি। এরকম আরও অসংখ্য সত্য দিয়ে স্রষ্টা, আল্লাহ্ ধর্ম প্রেরণ কোরেছেন। কিন্তু আজকের ধর্মের ধারক বাহকেরা এই ধর্মের মধ্যে বসবাস করেন কিন্তু তাদের দৃষ্টিশক্তি না থাকার কারণে এই বৃহৎ সত্যগুলিও তারা দেখতে পায় না। কেউ দেখিয়ে দেওয়া চেষ্টা কোরলেও সেটা পণ্ডশ্রম, যেমন পূর্বে বোলে এসেছি একজন অন্ধের কাছে লাল সাদা, আলো আঁধারের কোন প্রভেদ নেই। দীনের কয়েকটি মূলনীতি অর্থাৎ সত্য থেকে এই ধর্মজীবি আলেমরা বিচ্যুত। উদাহরণস্বরূপ সূরা বাকারার ১৭৪-১৭৬ নং পর্যন্ত আয়াতগুলি উল্লেখ কোরছি। আল্লাহ বলেন, আল্লাহ যে কেতাব অবতীর্ণ করেছেন যারা তা **গোপন করে এবং বিনিময়ে তুচ্ছমূল্য গ্রহণ করে** তারা- (১) নিজেদের পেটে আগুন ছাড়া কিছুই পুরে না, (২) কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাদের সঙ্গে কথা বোলবেন না, (৩) আল্লাহ তাদের পবিত্রও কোরবেন না, (৪) তারা ক্ষমার পরিবর্তে শাস্তি ক্রয় কোরেছে, (৫) তারা হেদায়াতের পরিবর্তে পথভ্রষ্টতা, গোমরাহী ক্রয় কোরেছে, (৬) তারা দীন সম্পর্কে ঘোরতর মতভেদে লিপ্ত আছে (৭) আগুন সহ্য কোরতে তারা কতই না ধৈর্য্যশীল অর্থাৎ মোটকথা তারা নিকৃষ্টতম জাহান্নামী।

এ আয়াত থেকে যে সত্যগুলি উদ্ভাসিত হয় তা নিম্নরূপ:

(১) ধর্মকে পূজি কোরে ব্যবসা করা যাবে না, কারণ ধর্ম সত্য। সত্য নিয়ে ব্যবসা চলে না, ব্যবসা কোরলে সত্য বিকৃত হোয়ে যায়, অর্থাৎ সেটা মিথ্যায় পরিণত হয়।

(২) ধর্মের কোন বিধানকে মানুষের কাছ থেকে গোপন করা যাবে না। কে সেটা মানবে কে মানবে না সেটা মানুষের ইচ্ছা। কিন্তু স্রষ্টা যে হক তাঁর কেতাবে মানবজাতির জন্য পাঠিয়েছেন মানুষের সামনে প্রকাশ কোরতেই হবে তা অন্যের কাছে যতই রূঢ় মনে হোক না কেন। সেই বিধান প্রকাশের ফলে যদি নিজের বিরাট ক্ষতি হয় তবু সেটা গোপন রাখা যাবে না।

(৩) এর ছোটখাটো বিষয়ের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ কোরে সেগুলি নিয়ে মতভেদ কোরে ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে বিভক্তি সৃষ্টি করা যাবে না।

প্রকৃতপক্ষে ধর্ম কোন উপাসনার বিষয় নয়, এটি হোচ্ছে মানবজীবনে শান্তি আনয়নের পন্থা অর্থাৎ মানবতার পার্থিব কল্যাণ ও শান্তিবিধান এবং পরকালীন মুক্তিই ধর্মের চূড়ান্ত লক্ষ্য। এর দ্বারা যদি মানবজাতি শান্তিই না পায় তবে ঐ ধর্ম থাকা না থাকা সমান কথা। আল্লাহ বোলেছেন, আল্লাহ যা নাজেল কোরেছেন তা যদি জীবনে বাস্তবায়িত না করা হয় তালো সেটা ভিত্তিহীন (সূরা মায়েদা ৬৮)। এই ধর্মজীবিরা দীনকে উপাসনার বস্তু বানিয়ে রেখেছে। দীনের এই নিগূঢ় সত্যগুলির একটিও তাদের দৃষ্টিগোচর হোচ্ছে না, ফলে তারা এর সবকটির বিরুদ্ধাচারণ করেন।

[সমস্ত পৃথিবীময় অন্যায়, অবিচার, যুদ্ধ ও রক্তপাত ইত্যাদি নির্মূল করে ন্যায়, সুবিচার ও শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৯৫ সনে এমামুয্যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী হেযবুত তওহীদ নামক আন্দোলনটি প্রতিষ্ঠা করেন। আল্লাহ তাঁকে প্রকৃত এসলামের যে জ্ঞান দান কোরেছেন তা তিনি যতটা সম্ভব হোয়েছে বই-পুস্তক লিখে, বক্তব্যের মাধ্যমে প্রচারের চেষ্টা কোরেছেন। এই নিবন্ধটির লেখক মোহাম্মদ মসীহ উর রহমান যামানার এমামের একজন অনুসারী এবং হেযবুত তওহীদের আমীর।]

এসলামে 'সালাম' প্রসঙ্গ

এম আমিনুল এসলাম

সালামের সওয়াব

এসলাম একটি সার্বজনীন জীবন ব্যবস্থা। এখানে কোন কাজের বা কোন রীতি-নীতির উদ্দেশ্য একটা থাকলেও এর উপকারিতা কিন্তু বহুরকমের। যখনই কোন মানুষ, সমাজ, জাতি বা দেশ এসলামের এ সব নীতিকে তাদের জীবনের সর্ব অঙ্গনে প্রতিষ্ঠিত কোরবে তখনই তারা এর যাবতীয় সুফল পেতে থাকবে। তেমনি সালামের দ্বারা পারস্পরিক সম্ভাষণ, বন্ধুত্ব, ঐক্যের প্রতীক ইত্যাদি ছাড়াও পরকালীন জীবনের পাথেয় সংগ্রহের একটি উপায়।

(১) আল্লাহ বলেন, যখন তোমাদেরকে কেউ সালাম করে তখন তোমরা সেটা অপেক্ষা উত্তম শব্দ দ্বারা সালামের জবাব দাও। অথবা কমপক্ষে জবাবের মধ্যে ঐ শব্দগুলি বোলে দাও যা প্রথম ব্যক্তি বোলেছে। নিশ্চয় আল্লাহ প্রত্যেক আমলের হিসাব নিবেন (সূরা নেসা-৮৬)।

(২) সালাম প্রদানকারীকে উত্তর দানকারীর চেয়ে বেশি নেকী বা সওয়াব দেওয়ার কথা হাদীসে উল্লেখ রয়েছে। আবু উমামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসুলাল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "মানুষের মধ্যে সেই ব্যক্তি আল্লাহর অধিক নিকটতম, যে আগে সালাম দেয় (আবু দাউদ)।"

উপরোল্লিখিত সালামের গুরুত্ব, মর্যাদা ইত্যাদির দিকে দৃষ্টি না দিয়ে বর্তমান প্রচলিত এসলামিক সমাজে সালাম একটি রেওয়াজ-রসুমে পরিণত হয়েছে। সালামের এই দুরবস্থায় এটা দৃষ্টিকটু তো বটেই আল্লাহর দেওয়া একটি বিধানের সাথে বেআদবিও বলা চলে। আবার সমাজের ক্ষমতালোভী এক শ্রেণীর মানুষ ছাড়াও ধর্মব্যবসায়ী পণ্ডিতরা সালাম দেওয়ার বা সালামের গুরুত্বের ওয়াজ নসিহত খুব করেন কিন্তু নিজেরা সালাম পাওয়ার জন্য মুখিয়ে থাকেন। অনেক ক্ষেত্রে এই শ্রেণীর লোকদেরকে সালাম না দিলে বে-আদব, অসভ্য ইত্যাদি কটু কথাও শুনতে হয় অহরহ। মনে হয় যেন সালাম পাওয়া তাদের পৈত্রিক অধিকার। আবার তারাও সালাম দেন তবে সময় হিসেব করে। যখনই পাড়া মহল্লার মসজিদ মাদ্রাসা এয়াতিমখানা ইত্যাদির জন্য নজরানা নিতে যান তখন এই ধর্মজীবী মোল্লা শ্রেণী কাকে সালাম দিচ্ছেন এই বোধশক্তি হারিয়ে ফেলেন, শুধু মনে রাখেন কত দ্রুত এবং কত সহিহ্ভাবে সালাম দেওয়া যায়। কারণ এই সালামের মধ্যেই নিহিত আছে যাবতীয় আশার আলো। আরেক দল সালাম দেওয়া নিজের জন্য ফরজ মনে করেন যখন ক্ষমতার পালা বদল হয় তখন। ইদানিং পাড়া-মহল্লায় অনেক নেতা, পাতি নেতাও তাদের কর্মীদের কাছে সালাম পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করেন। যাহোক তবে এ কথা বলা যায় যে, সালামের প্রচলন আমাদের সমাজের সর্বত্র মোটামুটি আছে। তবে আত্মাহীনভাবে নামসর্বস্ব সালাম দেওয়ার কারণে সালামের যে উদ্দেশ্য, সালামের যে শিক্ষা, সালাম দেওয়া ও নেওয়ার যে উপকারিতা তা থেকে ব্যক্তি, সমাজ, জাতি কেউ উপকৃত হোচ্ছে না।

সালাম অহংকারমুক্ত হবার একটা অবলম্বন

মানুষ যখনই পার্থিব বিষয়ে নিজেকে অন্যের থেকে অভাবমুক্ত মনে করে, অন্যের থেকে বেশি জ্ঞানী মনে করে, পরকালীন জীবনের জন্য নিজেকে অন্যের থেকে বেশি আমলধারী মনে করে তখনই এবলিস ঐ ব্যক্তির মধ্যে বাসা বাঁধে এবং অত্যন্ত সুক্ষ্মভাবে অহংকারের সূচনা করে। এ কারণে আমাদের সমাজে প্রায়ই দেখা যায়, অবস্থা-সম্পন্ন ব্যক্তিরা দরিদ্রের থেকে সালামের আশা করেন, নিজেরা আগে সালাম দিতে চান না। অধিক শিক্ষিতরা অল্প শিক্ষিতের থেকে সালাম পাওয়ার অপেক্ষায় থাকেন, অফিসের বস তার অধীনস্তদের সালামের আশা করেন, বড়রা ছোটদের কাছে আশা করেন, মাদ্রাসা-শিক্ষিত, দাড়ি, টুপি, জোব্বাধারী বড় বড় হুজুররা (!) তো সালাম পেতেই চিরকাল অভ্যস্ত, নিজেরা সাধারণ মানুষদেরকে আগে সালাম দেন এমন ঘটনা খুব বিরল। এটা আসলে আমাদের ভিতরে অহঙ্কারের বহিঃপ্রকাশ। আমরা সবাই একটি হাদীস খুব ভালোভাবে জানি যে, 'অহংকার হোচ্ছে আল্লাহর চাদর, এটা নিয়ে টানাটানি করা মানেই নিজের ধ্বংস অনিবার্য।' ব্যক্তিবিশেষের কাছ থেকে নিজেকে অহংকারমুক্ত রাখার অন্যতম উপায় হলো দেখা হোলেই বেশি বেশি কোরে বিনয়ের সাথে সালাম দেয়া। রসুলাল্লাহ (সা) বোলেছেনঃ মহান আল্লাহর কাছে ঐ ব্যক্তি শ্রেয়, যে আগে সালাম দেয় (সহীহ আবু দাউদ)। সুতরাং মো'মেনদের এই মনোভাব হওয়া উচিত যে, আমিই আগে সালাম দেব। তবে অহংকার কিছুটা হলেও প্রশমিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

সালাম জান্নাতের একটি পরিভাষা

প্রত্যেকটি জাতির কিছু কিছু সংস্কৃতি থাকে তদ্রুপ জান্নাতীদের সংস্কৃতি হলো সালাম। এটা জান্নাতের পরিভাষাসমূহের অন্যতম একটি। একে অপরের প্রতি জান্নাতবাসীদের সম্বোধন হবে সালাম (সূরা আরাফ- ৪৬, সূরা ইউনুস- ১০, সূরা এব্রাহিম- ২৩, সূরা মারইয়াম- ৬২)। মালায়েকগণ যখন পবিত্র কোন আত্মার রুহ কবজ করে তখনই তাকে সালামের মাধ্যমে সম্ভাষণ জানায় (সূরা নাহল- ৩২)। এছাড়াও আল্লাহ স্পষ্ট কোরেই বোলছেন যে, জান্নাতীদের অভ্যর্থনা হবে সালাম (সূরা ফুরকান- ৭৫)। আল্লাহর সঙ্গে যেদিন মো'মেনদের সাক্ষাত হবে সেদিনের অভিবাদনও হবে সালাম (সূরা আহযাব- ৪৪)। জান্নাতে প্রবেশের পূর্বে জান্নাতের রক্ষীরাও সালাম দিয়েই মো'মেনদেরকে অভিবাদন জানাবে (সূরা যুমার ৭৩, সূরা কাফ ৩৪)। জান্নাতের ভিতরেও মো'মেনগণ কোন অসার কথা বা পাপবাক্য শুনবে না শুধুই সালাম এবং সালাম এটাই হবে তাদের উল্লেখযোগ্য একটি ভাষা (ওয়াকেয়া ২৫, ২৬)। এ ছাড়া কোন কোন পুণ্যাত্মাকে সম্মানিত করার জন্য আল্লাহ এভাবেই ঘোষণা দিয়েছেন যে, 'তার প্রতি সালাম যেদিন সে জন্মলাভ করে, যেদিন তার মৃত্যু হবে এবং যেদিন সে জীবিত অবস্থায় উত্থিত হবে (মারইয়াম- ১৫, ৩৩)।

সালাম সম্পর্কে যামানার এমামের শিক্ষাঃ আজ সমস্ত পৃথিবীর কোথাও আল্লাহর তওহীদ প্রতিষ্ঠিত নেই। বিশেষ কোরে মোসলেম নামক এই জাতি কলেমার তওহীদের "আল্লাহ ছাড়া কারো হুকুম মানবো না" এই চুক্তি থেকে সরে গেছে। এই জাতি তাদের জাতীয় ও সামাজিক জীবনে আল্লাহর হুকুম বাদ দিয়ে পাশ্চাত্য ইহুদি-খ্রিস্টান সভ্যতা অর্থাৎ দাজ্জালের তৈরি গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, রাজতন্ত্র ইত্যাদি তন্ত্র-মন্ত্র মেনে নিয়েছে। কাজেই এরা যতই নামাজ পড়ুক, রোজা রাখুক, হজ্ব কোরুক এরা আর মো'মেন না, মোসলেমও না আর উম্মতে মোহাম্মদী হবার তো প্রশ্নই ওঠে না। সুতরাং এই জাতি কার্যতঃ কাফের ও মোশরেক। কাফের, মোশরেকদের জন্য সবচেয়ে বড় দোয়া হোচ্ছে তাদের হেদায়াতের জন্য দোয়া করা। এজন্য মাননীয় এমামুয্যামানের নির্দেশনা মোতাবেক হেযবুত তওহীদের সদস্যরা যারা তাগুতের সার্বভৌমত্ব অস্বীকার কোরে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব মেনে নেয় তাদেরকে "সালামু আলাইকুম" বোলে অভিবাদন জানায়। আর যারা এখনও তাগুতের সার্বভৌমত্ব মেনে আছে তাদেরকে অভিবাদন জানাতে বলেন "সালামু আলাইকুম ইয়াহদিকুমাল্লাহ" অর্থাৎ আল্লাহ আপনার প্রতি শান্তি বর্ষণ কোরুন এবং আপনাকে হেদায়াত কোরুন।

২৪ পৃষ্ঠার পর: পুরুষ, শিশুসহ মোট ২৩ জনকে এ্যারেস্ট কোরে নিয়ে যায়। এই ফাঁকে ওরা আমাদের বাড়ির আসবাবপত্র, পুকুরের মাছ, গাছ-পালা, মাঠের ফসল সবকিছু লুট কোরে নিয়ে যায়। প্রায় তিন মাস পরে আমরা মুক্তি পাই। কিন্তু মোল্লাদের কারণে দুই বছর আমরা বাড়ি ফিরে যেতে পারি নাই। তখন আমি সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র ছিলাম। এই সমস্ত ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে পড়ে আমার শিক্ষাজীবনের সমাপ্তি ঘটে। এই সময়ে আমাদের সর্বাত্মক বালাগ শুরু হোলে আমি নিজেকে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর রাস্তায় নিয়োজিত কোরি। আমি রাস্তায় রাস্তায় দাজ্জাল, রূপরেখা, সালাহ, হেযবুত তওহীদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, জেহাদ কেতাল সন্ত্রাস, মহাসত্যের আহ্বান ও বিভিন্ন লিফলেট বিলি কোরি। এইভাবে বালাগ করার সময়ও আমি কয়েকবার প্রশাসন, র‍্যাবের দ্বারা অত্যাচারিত হোই। আমি দুইবার গ্রেফতার হোই এবং নির্দোষ প্রমাণিত হোয়ে মামলা থেকে অব্যহতি পাই।

প্রতিবারই আমি তাদেরকে চিৎকার কোরে বোলি, "হেযবুত তওহীদ নিষিদ্ধ নয়, হেযবুত তওহীদ সত্য, হেযবুত তওহীদ হক, এর এমাম হক, হেযবুত তওহীদ দিয়ে সারা পৃথিবীতে দীন প্রতিষ্ঠিত হবে, আপনারা বেঁচে থাকলে দেখবেন এনশা'আল্লাহ।"

২০০৯ সালে জেল থেকে বের হবার পর আমি আর গ্রামে আমাদের বাড়িতে ফিরে যাই নি। ২০১১ সালে সবাই যখন গ্রামে ফিরে যায় তখন আমি আমাদের আমীরের তৈরী একটি মসজিদ ঘরে কিছুদিন ২০১২ সালে আমাদের প্রিয় এমামুয্যামান পর্দা করার পরে আমাদের মাননীয় এমামের আহ্বানে আবার আমি ঘর ছেড়ে আল্লাহর রাস্তায় বের হোয়ে পড়ি। বালাগের উদ্দেশ্যে ১০ দিনের সফরে আমি কুমিল্লায় যাই। এরই মধ্যে খবর পাই আমার আব্বা বিদেশে কর্মরত অবস্থায় এন্তেকাল কোরেছেন। আব্বা হেযবুত তওহীদ গ্রহণ করেন নাই, তবে তিনি এই সত্য সমর্থন কোরতেন। আমাকে বাধা না দিয়ে উৎসাহ দিতেন। বাবার এন্তেকালের পর আমাকে মায়ের সঙ্গে দেখা করার জন্য অনেকে বলে কিন্তু আমি আমার কাজ শেষ না কোরে বাড়ি না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেই। আমার মনে হোয়েছে আমার বাড়ি যাওয়ার চাইতে দ্বীনের কাজ অনেক বড়। পৃথিবীতে এখন সবচাইতে কঠিন কাজ হোল আল্লাহর সত্যদীনের কথা বলা। মহানবী বোলেছেন, হাতের তালুতে জ্বলন্ত কয়লা রাখা যেমন কঠিন, তেমনি সমস্ত দুনিয়াতে যখন দাজ্জালের জয়জয়কার, তখন তওহীদে টিকে থাকাও অত্যন্ত কষ্টকর। আমি স্বপ্ন দেখি এবং বিশ্বাস কোরি, খুব শিগগিরই আল্লাহ তাঁর সুলতানান নাসীরাহ দান কোরবেন এবং আমরা দুনিয়ার সমস্ত অশান্তি দূর কোরে শান্তি প্রতিষ্ঠা কোরব এনশা'আল্লাহ। এই জাতি তার হারানো গৌরব ফিরে পাবে, এদের লাঞ্ছনা ও গ্লানি দূর হবে।

মো: রাসেল, বয়স: ২১ বছর, পিতা: জলিল, মাতা: রহিমা বেগম, গ্রাম: পোরকরা, পোস্ট: পোরকরা, থানা: সোনাইমুড়ি, জেলা: নোয়াখালী।

আমি হব সকাল বেলার পাখি

আমি হব সকাল বেলার পাখি
সবার আগে কুসুম বাগে
উঠব আমি ডাকি।

সুয্যি মামা জাগার আগে
উঠব আমি জেগে,
'হয়নি সকাল, ঘুমোও এখন'
মা বলবেন রেগে।

বলব আমি-'আলসে মেয়ে
ঘুমিয়ে তুমি থাক,
হয়নি সকাল, তাই বলে কি
সকাল হবে নাকো?'

আমরা যদি না জাগি মা
কেমনে সকাল হবে?
তোমার ছেলে উঠবে মা গো
রাত পোহাবে তবে।

ছোটবেলা এই কবিতাটি পাঠ্যপুস্তকে থাকার সুবাদে বহুবার পড়েছি। অনেক সময় দলবেধে কয়েকজন মিলে পড়তাম; কিন্তু কবি কেন এই কবিতা লিখেছেন তার কিছুই তখন বুঝি নি। আজ এই পরিণত বয়সে আন্দাজ কোরতে পারছি বিদ্রোহী কবি নজরুল এ কবিতায় কী বুঝাতে চেয়েছেন। আমার কাছে এই কবিতা নতুনভাবে ধরা দিয়েছে। আমার অনুভূতি পাঠকের সঙ্গে ভাগাভাগি করার জন্য পেশ কোরলাম, জানি না ক'জন আমার সঙ্গে একমত হবেন।

এখানে 'সকাল বেলা' বোলতে কবি দিনবদলের কথা, নতুন সভ্যতার কথা বোলেছেন। যেখানে অন্ধকার, গোলামী, হানাহানি, অভাব, দরিদ্র, অন্যায়, অবিচার থাকবে না। আর অন্ধকার দিনের অবসান ঘটিয়ে শুভ সকাল অর্থ্যাৎ নয়া সভ্যতার শুরুতেই জেগে উঠবেন কবি এবং জাতিকে গোলামীর জিঞ্জির থেকে মুক্ত কোরবেন। সকাল বেলায় পাখি যেমন নতুন দিনের আগমনী বার্তা ঘোষণা করে, মানুষকে ঘুম থেকে জাগায় তেমনি কবিও একটি আলোকময় নতুন সভ্যতার ঘোষক হোতে চান। তাই তিনি জাগতে চান দিন শুরু হওয়া অর্থাৎ 'সুয্যি মামা' জাগার আগেই। মা এখানে পুরাতন জরাজীর্ণ সমাজের প্রতীক। একটি নতুন সভ্যতার জন্ম দিতে যখন কিছু মানুষ রাজপথে নেমে আসে, বিপ্লবের স্বপ্ন দেখে, তখন প্রাচীনপন্থীরা তাদের বহুযুগের সংস্কারকেই আঁকড়ে ধোরে রাখতে চায়। তারা ধমক দিয়ে বলে, "হয় নি সকাল ঘুমোও এখন"। এইভাবে তারা নতুনদেরকে ঘরে আটকে রাখতে চায়। তাদের প্রতি কবি বোলছেন, মা, তুমি আলসে হোতে পার, অত্যাচারকে মুখ বুজে সইতে পার, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ না কোরতে পারো, কিন্তু তা বোলে কি সমাজ পরিবর্তন হবে না? নতুন সভ্যতার আগমন ঘটবে না? নতুন দিনের সূর্য্য উঠবেই উঠবে। কেউ তাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। তোমার ছেলে উঠুক না উঠুক, জাগুক না জাগুক, অন্যরা জাগবেই। তাদের ঘুম ভাঙবেই।

শেষ চার চরণে কবি অভিমানের সুরে বোলেছেন, আমাকে তো জাগতেই হবে। আমরা না জাগলে কিভাবে সকাল হবে? অন্ধকার গোলামী, জুলুম, অত্যাচার এর অবসান ঘটিয়ে মুক্তির, সত্যের, ন্যায়ের প্রভাত আমাকেই তো আনতে হবে। তোমার মতো মায়েরা যদি তাদের সন্তানদের আদর কোরে ঘুম পাড়িয়ে রাখে তবে জাতির কখনও মুক্তি আসবে না। জাতির জীবন থেকে রাতের নিকষ অন্ধকার দূর হবে না। অন্যায়, অবিচার, অশান্তির কালো মেঘ দূরীভূত হোয়ে ন্যায় ও শান্তির আলোকময় সভ্যতা শুরু হবে না। কাজেই মাগো তোমরা আর তোমাদের সন্তানদের ঘুম পাড়িয়ে রেখো না। তাদের জাগাও, তাদের জাগতে দাও। তাদের কানে ঘুম পাড়ানী গান নয়, বিপ্লবের মন্ত্র গাও। অন্ধকার দূর হবেই হবে। মুক্তির নতুন প্রভাত আসবেই আসবে।

বাংলা ভাষায় প্রবিষ্ট আরবী শব্দের বিকৃতি

মোহাম্মদ রিয়াদুল হাসান

আসুন সিস্টেমটা পাল্টাই

এ কথা সর্বজনবিদিত যে, বর্তমান বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত বিদেশী ভাষার শব্দ যেমন- আরবি, ফারসি, উর্দু, ইংরেজি, চাইনিজ ইত্যাদির উচ্চারণ রীতিতে যথেষ্ট ভুল-ভ্রান্তি পরিলক্ষিত হোচ্ছে। শুধু বলার সময় উচ্চারণে ভুল হোলে কথা ছিল না, লেখার বেলায়ও যদি ভুল হয় তবে তা কোন ক্রমেই গ্রহণযোগ্য হোতে পারে না। বর্তমানে ইংরেজি আন্তর্জাতিক ভাষা, সর্বত্র ইংরেজির জয়জয়কার। তাই ইংরেজি শব্দের বাংলা বানানের বিভ্রাট অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ কোরেছে। কিন্তু এটা ইতিহাস যে, এ দেশে ইংরেজি ভাষা প্রবেশের বহু পূর্বেই আরবি ও ফারসি ভাষাভাষীরা শত শত বছর এ দেশ শাসন কোরেছেন, তাদের ধর্ম, সংস্কৃতি দিয়ে এদেশের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ কোরেছেন। তাদের ভাষা থেকে শত শত শব্দ বাংলা ভাষায় ঠাঁই কোরে নিয়েছে। কাজী রফিকুল হক এর সম্পাদনায় বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রকাশিত অভিধানে ১৭১৭ টি আরবি শব্দ বাংলা ভাষায় ব্যবহারের কথা উল্লেখ করা হয়। ফার্সী ভাষা আছে এর চেয়েও বেশী। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় বাংলায় ব্যবহৃত অধিকাংশ আরবি শব্দের যথাযথ উচ্চারণ এবং বাংলা বানান এর মূল ভাষার ধারে-কাছেও রাখা হয় নি যেটা সম্পূর্ণ অনুচিত। কিছু কিছু শব্দ বানানের ক্ষেত্রে সঠিক থাকলেও ব্যবহারিকভাবে তার উচ্চারণ করা হোচ্ছে অশুদ্ধভাবে। অনেক শব্দ এই উভয় দোষেই দুষ্ট। ইংরেজি শব্দের সঠিক বানান নিয়ে যেমন কেউ কেউ লিখছেন, বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি শব্দের সঠিক ব্যবহার নিয়ে তেমন কোন উদ্যোগ পরিলক্ষিত হোচ্ছে না। এই ক্ষেত্রে সংস্কার সাধনের জন্য যিনি প্রথম উদ্যোগ নেন তিনি হেযবুত তওহীদের এমাম, এ যামানার এমাম, The Leader of the Time জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী। তিনি এ সব শব্দের সঠিক বানান ও উচ্চারণ ব্যবহার কোরেছেন তাঁর লিখিত বইগুলিতে।

আরবি শব্দ সমূহের বাংলা বানানরীতির কয়েকটি নিয়ম যেমন– (১) আরবি স্বরবর্ণ 'যের' এর জন্য বাংলায় 'এ'-কার ব্যবহার হয়। যেমন– বেসমেল্লাহ (২) 'যবর' এর জন্য ব্যবহার হয় 'আ'-কার। যেমন– আলহামদুলেল্লাহ (৩) 'পেশ' এর জন্য 'ও'-কার ব্যবহার হয়। যেমন– মোস্তাকেম, মোহাম্মদ (৪) 'খাড়া যের' এবং 'যের এর পরে যদি ইয়া সাকিন' থাকে তাহলে 'ি'-কার ব্যবহার হয়, কোন কোন ক্ষেত্রে 'ী'-কার ব্যবহার হয়। যেমন– রহিম, দোয়াল্লিন, (৫) আরবি ব্যঞ্জনবর্ণ 'ইয়া' এর উচ্চারণ বাংলায় 'ই' হবে 'এ' হবে না। যেমন– 'ইয়াতিম', 'এতিম' নয়, 'ইয়ামেন', 'এয়ামেন' নয়।

বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রকাশিত আরবি, ফারসি, তুর্কী, হিন্দী, ও উর্দু শব্দের বাংলা ভাষার অভিধানে আরবি শব্দগুলির যে বানান রীতি প্রণয়ন কোরছে সেখান থেকে কয়েকটি শব্দ সুচিন্তিত পাঠকদের জন্য উল্লেখ করা হলো। এই বানানগুলিও বিকৃত আরবি বানান রীতির কবলে পড়ে এখন প্রায়সই ভুলভাবে লেখা হোচ্ছে এবং সেই ভুলগুলি রীতিমত প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ কোরেছে। বলা হোচ্ছে আরবিতে নাকি এ-কারের এবং ও-কারের উচ্চারণই নেই যা সম্পূর্ণ অসত্য। কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যাক।

বাংলা একাডেমির "আরবি, ফারসি, তুর্কী, হিন্দী, ও উর্দু শব্দের বাংলা অভিধান" থেকে নিচের তালিকাটি দেওয়া হোল।

আভিধানিক উচ্চারণ	প্রচলিত ও বিকৃত উচ্চারণ
এসলাম, পৃষ্ঠা- ৪৬	ইসলাম
আলেম, পৃষ্ঠা- ২৮	আলিম
আশেক, পৃষ্ঠা- ৩০	আশিক
মোসলেম, পৃষ্ঠা- ২৮৯	মুসলিম
গালেব, গায়েব, পৃষ্ঠা- ১১২	গালিব
এন্তেকাল, পৃষ্ঠা- ৪৭	ইন্তেকাল
গাফেল, পৃষ্ঠা- ১১২	গাফিল
কেতাব, পৃষ্ঠা- ৭৭	কিতাব
কেয়ামত, পৃষ্ঠা- ৭৭	কিয়ামত
মোফাসসের, পৃষ্ঠা- ২৮৯	মুফাসসির
মোহাদ্দেস, পৃষ্ঠা- ২৯০	মুহাদ্দিস
লা এলাহা, পৃষ্ঠা- ৩০৪	লা ইলাহা
এহসান, পৃষ্ঠা- ৫০	ইহসান
এহরাম, পৃষ্ঠা- ৪৯	ইহরাম
কাফের, পৃষ্ঠা- ৬৬	কাফির
ফেতরা, পৃষ্ঠা- ২৪৫	ফিতরা
মো'জেজা, পৃষ্ঠা- ২৮৬,	মু'জিজা
মেহরাব, পৃষ্ঠা- ২৯২	সঠিক আছে
মো'মেন, পৃষ্ঠা- ২৯৩	মুমিন
হেজরী, পৃষ্ঠা- ৩৩৩	হিজরী
গেলাফ, পৃষ্ঠা- ১১৭,	গিলাফ
জেহাদ, পৃষ্ঠা- ১১৩,	জিহাদ
নাউজুবেল্লাহ, পৃষ্ঠা- ২১১	নাউজুবিল্লাহ
নাজেল, পৃষ্ঠা- ২১৩	নাজিল
মোনাফেক, পৃষ্ঠা- ২৮৭	মুনাফিক
এমাম, পৃষ্ঠা- ৩৭	ইমাম
একতেদা, পৃষ্ঠা- ৪৪,	ইকতেদা
এরশাদ, পৃষ্ঠা- ৪৮	ইরশাদ
একামত, পৃষ্ঠা- ৪৫	ইকামত
এছমে আযম, পৃষ্ঠা- ৪৬	ইসমে আযম
হেদায়েত, পৃষ্ঠা- ৩৩৩	হিদায়াত
খেলাফত, পৃষ্ঠা- ১০১	খিলাফত
খেয়ানত, পৃষ্ঠা- ১০১	খিয়ানত

মোসলেম ভারত পত্রিকার প্রথমপাতা

এমন উদাহরণ আমরা আরও বহু দিতে পারবো কিন্তু যুক্তিজ্ঞানসম্পন্ন পাঠকের জন্য এ ক'টি উদাহরণই যথেষ্ট। আরব বিশ্বে ও বিভিন্ন মোসলেম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে আরবী শব্দের উচ্চারণে যেরের স্থলে এ-কারের ন্যায় উচ্চারণ করার কয়েকটি নমুনা তুলে ধোরছি। বর্ত্তমানে পত্রপত্রিকায় মধ্যপ্রাচ্যের নেতৃবৃন্দের ও কয়েকটি স্থানের নামের বানান লক্ষ্য কোরুন:

১. ওসামা বিন লাদেন, 'লাদিন' লেখা হয় না।
২. বেন আলী (তিউনেশিয়ার সাবেক প্রধান), 'বিন আলী' লেখা হয় না।
৩. বেন বেল্লাহ (আলজেরিয়ার সাবেক প্রেসিডেন্ট), 'বিন বিল্লাহ' লেখা হয় না।
৪. আলী আব্দাল্লাহ সালেহ (ইয়ামেনের সাবেক প্রেসিডেন্ট), 'সালিহ' লেখা হয় না।
৫. বেন গাজী (লিবিয়ার শহর), 'বিন গাজী' লেখা হয় না।
৬. এল বারাদি (মিশরীয় কুটনীতিক), ইল বারাদি লেখা হয় না।

আবার খেয়াল কোরুন ইয়াকীন শব্দটি। আরবি ইয়া'র উপরে যবর। ইয়া একটি স্বরবর্ণ। এর উপরে যবর হওয়ার ফলে স্বভাবতই শব্দটির প্রথম অংশের উচ্চারণ ও বানান হবে 'ইয়া'। তবে ক্বাফ-এর নিচে যের থাকায় এর উচ্চারণ এ-কার দিয়ে হবে। অর্থাৎ ইয়াকিন শব্দটির সঠিক উচ্চারণ হবে ইয়াকেন। ঠিক যেভাবে হয় ইয়ামেন, ইয়ামিন হয় না। একইভাবে ইয়াসির এর সঠিক উচ্চারণ ও বানান হবে ইয়াসের। আইন একটি স্বরবর্ণ। এর নিচে যের হোলেও ই-কার হবে। বর্ত্তমানে লেখার ক্ষেত্রে ইয়া বর্ণের বেলায় 'ই' কার অর্থাৎ 'ি' ব্যবহৃত হয়। আবার যের এর জন্যও 'ই' ব্যবহৃত হয় যা একেবারেই যুক্তিসঙ্গত নয়।

মাত্র ৩০/৪০ বছর আগেও সর্বত্র আরবি 'যের' এর উচ্চারণ এ-কার দিয়েই করা হোত। উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলেম মওলানা আকরাম খাঁ রচিত বিখ্যাত 'মোস্তফা চরিত' গ্রন্থটিতেও এসলামের বানান 'এছলাম'। তার সমসাময়িক সবাই এভাবেই লিখতেন। কবি কাজী নজরুল ইসলামও তার নামের বানানে 'এসলাম' লিখতেন। তখনকার একটি বহুল প্রচারিত পত্রিকার নাম ছিলো 'মোসলেম ভারত', 'মুসলিম ভারত' নয়। এমনকি আমরাও অনেক আরবি শব্দ এ-কার এবং ও-কার দিয়ে উচ্চারণ কোরি যা এগুলি অভিধান মোতাবেক শুদ্ধ উচ্চারণ। যেমনঃ কায়েম, মোবারক, মোকাবেলা, মেহরাব, কাফেলা, কাফের, মোশরেক, আলেম, জালেম, এবাদত, জামে মসজিদ, এজাহার, এতেকাফ, গায়েব, এশা, হাফেজ ইত্যাদি। কিছুদিন হোল আরবি থেকে এ-কার (ে) এবং ও-কার (ো) এর ব্যবহার বাদ দেওয়া হোচ্ছে। এ পদ্ধতি যারা চালু কোরেছেন তারা শুধু যে একটি ভুলই কোরেছেন তাই নয়, তারা পুরো আরবি ভাষা থেকে দু'টি উচ্চারণই বাদ দিয়ে দিয়েছেন। এমনিতেই আরবি ভাষা উচ্চারণের (Phonetics) দিক থেকে খুব বেশী সমৃদ্ধ নয়; চ, ট, ঠ, থ, প, ড় ইত্যাদি অনেক উচ্চারণই এ ভাষায় নেই। তার মধ্যে এ ভাষা থেকে 'এ' (A) এবং ও (O)-কারের মত দু'টি গুরুত্বপূর্ণ উচ্চারণ উঠিয়ে দিয়ে আরবি ভাষাকে আরো দরিদ্র করা হোচ্ছে।

বাংলাদেশে সম্প্রতি একটি আন্দোলনের নাম 'হেফাজতে ইসলাম' রাখা হোয়েছে। লক্ষণীয় এ আন্দোলনের উদ্যোক্তারা প্রায় সবাই বড় বড় মাদ্রাসা শিক্ষিত ব্যক্তি। এই ক্ষেত্রে আলেমরা 'হিফাজত-ই-ইসলাম' না লিখে 'হেফাজতে ইসলাম' লিখেছেন অর্থাৎ একই শব্দের মধ্যে দুইটি এ-কার ব্যবহার কোরেছেন; প্রকৃতপক্ষে তারা 'হেফাজত' বানান ঠিকই লিখেছেন। কিন্তু যে কারণে তারা 'হেফাজত' লিখেছেন সেই একই কারণে তাদের 'ইসলাম' না লিখে 'এসলাম' লেখা উচিৎ ছিল। কারণ এখানেও আলিফের নিচে যের রোয়েছে। হা-এর নিচে 'যের' থাকায় যদি 'হেফাজত' উচ্চারণ হয়, আলিফের নিচে যের থাকলে ভিন্ন সিদ্ধান্ত হোতে পারে না। সুতরাং এখানেও 'ইসলাম' না হোয়ে সঠিক উচ্চারণ হবে 'এসলাম'।

উচ্চারণ তত্ত্বে (Phonetics) এমনিতেই আরবি দরিদ্র ভাষা তার মধ্যে যদি নির্দিষ্ট উচ্চারণ বাদ দেওয়া হয় তবে কালক্রমে এই ভাষা আরো দরিদ্র হোয়ে পড়বে এবং এক সময় পূর্ণ বিকৃত হোয়ে যাবে। তাই এখনই সময় এসেছে আরবি ভাষাকে বাংলায় লেখা এবং বলার সময় সঠিকভাবে বলা এবং সঠিক উচ্চারণটি লেখা।

মসজিদে দুনিয়াবি কথা বলা কে হারাম কোরল?

মেজবাহ উল এসলাম

আমরা প্রায়ই মসজিদের ভেতরে লেখা দেখি, "মসজিদে দুনিয়াবি কথা বলা হারাম- আল হাদীস।" এই হাদীস কোত্থেকে আসলো, কে এর সঙ্কলক, কোন বইতে এটি লিপিবদ্ধ আছে তা কেউ কোনদিন লেখে না। এটি হোচ্ছে একটি মৌখিক ও প্রচলিত হাদীস। মিথ্যার অনেক প্রকারভেদ আছে। কিছু মিথ্যা আছে জাতিবিনাশী, বিধ্বংসী মিথ্যা। রসুলাল্লাহর নামে যে মিথ্যাটি মসজিদের দেয়ালে লিখে মোসলেম জাতির মধ্যে চালিয়ে দেওয়া হোয়েছে সেটিও এমনই একটি জাতি বিনাশী সুদূর প্রসারী ষড়যন্ত্রের জালবিস্তারকারী মিথ্যা। এই মিথ্যাকে যদি সত্য হিসাবে মেনে নেই, তাহোলে প্রকৃত এসলামের ইতিহাসকে এবং তার পরবর্তী অন্তত পাঁচ শতাব্দীর ইতিহাসকে মিথ্যা বোলে স্বীকার কোরে নিতে হবে। কারণ মসজিদের উদ্ভবই হোয়েছে মোসলেম উম্মাহর 'দুনিয়াবী কাজের' কেন্দ্রীয় কার্যালয় হিসাবে। সুতরাং এটি যে কেবল মিথ্যাই নয়, এটি সত্যের একেবারে বিপরীত।

প্রথমে দেখা যাক 'দুনিয়া' শব্দটির অর্থ কি। এসলামের অন্যান্য বিষয়গুলির মতই 'দুনিয়া' শব্দটিও আজ বিপরীত অর্থে ব্যবহার করা হয়। আমরা বর্তমানের বিকৃত এসলামের আলেম সাহেবদের কাছে শুনেছি যে দুনিয়া খুবই খারাপ জায়গা। তাই দুনিয়ার দিকে দৃষ্টি না দিয়ে আখেরাতের অভিমুখী হোতে হবে, চোখ কান বুঁজে এ দুনিয়ার জীবনকে কোনমতে পার কোরে দিতে পারলেই মুক্তি। কিন্তু দুনিয়ার এই অর্থ সঠিক নয়। এসলাম এসেছে সমস্ত দুনিয়াময় শান্তি (এসলাম) প্রতিষ্ঠা কোরতে এবং তাও সংগ্রামের মাধ্যমে। যেখানে দুনিয়াতেই একটি জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম, সেখানে সেই দুনিয়াকেই ত্যাগ বা তার গুরুত্ব কমিয়ে দেয়া কি কোরে অর্থবহ হোতে পারে? আল্লাহ কোর'আনে মো'মেনদের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে, নিশ্চয়ই তিনি তাদের পৃথিবীর জমিন ও ক্ষমতা দান কোরবেন, যেমন তিনি পূর্ববর্তী মো'মেনদেরও দান কোরেছিলেন (কোর'আন- সূরা আন-নূর-৫৫)। প্রকৃতপক্ষে দুনিয়া বলতে বোঝানো হোচ্ছে- আল্লাহ ও তাঁর রসুল এই জাতির, উম্মাহর জন্য যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য স্থির কোরে দিয়েছেন সেই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের পথে এই পৃথিবীতে যা কিছু পিছুটান হিসেবে বাঁধা হোয়ে দাঁড়াবে তাই দুনিয়া। আল্লাহ দুনিয়াকে প্রত্যাখ্যান কোরতে বলেন নি, তা বোললে তিনি কখনই আমাদের বোলতেন না এই দোয়া কোরতে যে- আমাদের পালনকারী! আমাদের এই দুনিয়াকে সুন্দর কোরে দাও এবং আখেরাতকেও সুন্দর কোরে দাও (সূরা আল-বাকারা-২০১)। সুতরাং দুনিয়া বর্জন করা এসলামের লক্ষ্য নয় বরং দুনিয়া সুন্দর, শান্তিদায়ক করাই কাম্য।

দুনিয়াময় শান্তি (এসলাম) প্রতিষ্ঠার সকল কার্যক্রম পরিচালিত হতো মসজিদ থেকে। যাকাত, সদকা, উশর, ফেতরা ইত্যাদি জনগণের মাঝে মসজিদ থেকেই বণ্টন করা হতো। মসজিদই ছিল বিচারালয়। সেখানে সামাজিক বিভিন্ন সমস্যাদির বিচার ফয়সালা করা হতো এবং কেউ দোষী সাব্যস্ত হোলে জুমার শেষে প্রকাশ্যে রায় কার্যকর করা হতো। মসজিদের সম্মুখস্থ ফাঁকা জায়গায় চোলত সামরিক প্রশিক্ষণ এবং মোজাহেদদের শরীর গঠনমূলক দৌড়, কুস্তিসহ বিভিন্ন খেলাধূলার আয়োজন করা হতো। তীর, বল্লম, নেজা ইত্যাদি চালনার প্রতিযোগিতা হতো। আজ সেখানে গোল হোয়ে বসে মিলাদ আর জিকির আসকার করা হয়। কোন কোন সময় ওয়াজ নসিহতের আয়োজনও করা হয়। আর তাতে বক্তার বক্তব্যের মূল বিষয় থাকে ঢিলা কুলুক, দস্তরখান বিছিয়ে খানা খাওয়ার ফজিলত, কিভাবে নারীদের বোরকার ভেতরে ঢুকানো যায়, কোন আমলে কত সোয়াব, বেপর্দা নারী কত ভয়াবহ ইত্যাদি। প্রকৃত এসলামের সময় মসজিদের মেহরাবে যুদ্ধ সরঞ্জাম, তীর ধনুক, নেজা, বল্লম, তলোয়ার ইত্যাদি রাখা হত। মসজিদেই ছিল যুদ্ধের জন্য সার্বক্ষণিক প্রস্তুত মোজাহেদদের বসবাস যাদেরকে বলা হোত আসহাবে সুফফা। বিভিন্ন গোত্র ও রাষ্ট্র থেকে আগত অতিথি, দূতগণের থাকা খাওয়ার জন্য (দূতাবাস) ব্যবস্থা করা হতো মসজিদেই। মসজিদ ছিল সদা কর্মচঞ্চল। আর আজকের বহুতলবিশিষ্ট, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বিশাল বিশাল মসজিদ নামাজের নির্দিষ্ট সময়টুকু ছাড়া সারাদিন তালাবদ্ধ অবস্থায় নিস্তব্ধতা নিয়ে পড়ে থাকে।

মসজিদই ছিল বিচারালয়। সেখানে সামাজিক বিভিন্ন সমস্যাদির বিচার ফয়সালা করা হতো এবং কেউ দোষী সাব্যস্ত হোলে জুমার শেষে প্রকাশ্যে রায় কার্যকর করা হতো।